S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

- ☑ নিবার্চন কমিশন
- ☑ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

- ❖ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- ❖ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা সমূহ
- ❖ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সাফল্য ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা
- ❖ বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা
- ❖ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি
- ❖ জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে বিরোধীদল
- ❖ সরকারী কর্ম কমিশন
- ❖ বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার

মোঃ মাহফুজুর রহমান

SMS : 01613 43 20 65

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

০৬

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে **Comment/Like** করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

Scanned by CamScanner

BCS Syllabus on Bangladesh Affairs

- **Political Parties: Historical development; Leadership; Social Bases; Structure; Ideology and Programmes; Factionalism; Politics of Alliances; Inter and Intra-Party Relations; Electoral Behaviour; Parties in Government and Opposition.**
- **Elections in Bangladesh. Management of Electoral Politics: Role of the Election Commission; Electoral Law; Campaigns; Representation of People's Order (RPO); Election Observation Teams.**

Student Work | সংক্ষিপ্ত

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি : (৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে :

নির্বাচন কমিশনের গঠন :

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী–

১. প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

২. একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বৎসরকাল হবে এবং
   ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না;
   খ. অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরুপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররুপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

৪. নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।

৫. সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরুপ নির্ধারণ করবেন, তেমনটি হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেধরণের পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সে ধরণের পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

৬. কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পরিবেন।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি : সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কাজ বা দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো :

(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরুপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী
   ক. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;
   খ. সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;
   গ. সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন; এবং
   ঘ. রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরুপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশন তার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। এছাড়া বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন ১০টি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের ৬৪টি জেলা নির্বাচন কার্যালয় এবং উপজেলা/থানা পর্যায়ের ৫১৪ টি উপজেলা ও থানা নির্বাচন কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মশালাসহ নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

Scanned by CamScanner

২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের আইনে একজন সাংসদের জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের একটি ধারাবাহিক পরিবর্তন চিত্র : (৩৫তম বিসিএস)

২০০১ সাল থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সর্বশেষ ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনে একজন প্রার্থী পোষ্টার, ব্যানার, সভা, প্রচারণা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের টাকা খরচ করে থাকেন। যদিও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একজন প্রার্থীর ব্যয়সীমা উল্লেখ করা থাকে এবং প্রার্থীর নির্বাচনী খরচ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা যাবে। এমনকি নির্বাচন কমিশন ঐ প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। তাই নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়সীমা একটি উল্লেখযোগ্য বিধি। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনেই নির্বাচন কমিশন এই বিধিকে প্রয়োগ করে। এমনকি স্থানীয় নির্বাচনেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যয়সীমা তুলে ধরা হলো :

সংসদ	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল	প্রার্থীদের অনুমোদিত ব্যয়সীমা
অষ্টম	২০০১	৫ লাখ
নবম	২০০৮	১৫ লাখ
দশম	২০১৪	২৫ লাখ

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ২০০৬ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে সেটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপরের সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অষ্টম সংসদ নির্বাচনে যেখানে একজন প্রার্থী ৫ লাখ টাকা ব্যয় করতে পারত, সেখানে নবম সংসদ নির্বাচনে ব্যয়সীমা করা হয় ১৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ ব্যয়সীমা বেড়েছে ২০০ শতাংশ। আবার দশম সংসদের ক্ষেত্রে বেড়ে দাড়িয়েছে ২৫ লাখ টাকায় অর্থাৎ নবম সংসদের তুলনায় দশম সংসদ নির্বাচনে বেড়েছে ৬৭ শতাংশ এবং অষ্টম সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দশম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর অনুমোদিত ব্যয়সীমা বেড়েছে ৫০০ শতাংশ।

কিন্তু সংবাদপত্র ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবেচনায় অধিকাংশ প্রার্থীর প্রকৃত নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমাকে আরো ছাড়িয়ে যায়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীকে সতর্ক করলেও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে খুব একটা দেখা যায় না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের এ ক্ষেত্রে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দল ব্যবস্থা : (৩৫তম বিসিএস)

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নবীন গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা লক্ষণীয়। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' ও 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বিএনপি)-এর মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল ঘটে যদিও ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। চারদলীয় জোট হলেও মূলত সরকারের মূল শক্তি ও নীতি নির্ধারক বিএনপি। তেমনি ২০০৮ সালেও ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলেও এই দলটিই রাজনীতির মাঠে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে দুটি প্রধান দলই ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তৃতীয় কোনো দলের একার পক্ষে সরকার গঠন সম্ভবপর মনে হয় না। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে রাজনীতি ও ক্ষমতা দুটি দলকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি : (৩৫তম বিসিএস)

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশের জনগণও প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই 'দলীয় সরকার' বলা হয়। এজন্য এর ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে :

১. **রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ :** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং এগুলোর জনসংখ্যাও বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।

২. **নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন :** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণ রায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।" রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।

Scanned by CamScanner

৩. **জনমত গঠন :** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে 'জনমত গঠন' করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।

৪. **প্রার্থী মনোনয়ন :** নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।

৫. **প্রচারণা :** রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকাজ চালায়। এর ফলে নির্বাচকমন্ডলী দেশের জন্য কোন দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

৬. **ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ :** রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে ভোটদাতাদের তালিকায় কোন নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় কোন অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

৭. **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।

৮. **বিরোধী ভূমিকা পালন :** সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো জনগণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দলও জনকল্যাণের কাজে উদ্যোগী হয়।

৯. **রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার :** রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১০. **স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ :** রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুল ধরে। এর ফলে কোন দলই গণবিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

১১. **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ :** রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

১২. **শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন :** জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য। সরকার পরিবর্তনের জন্য কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না। শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনে রাজনৈতিক দল সহায়তা করে।

১৩. **সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন :** সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেও রাজনৈতিক দল শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

১৪. **জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি :** রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৯১ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : (৩৫তম বিসিএস)

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ঘুরে ফিরে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছেই ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। একদল এখন ক্ষমতাসীন তো অন্যদল বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত। আবার অন্য দলটি ক্ষমতাসীন তো প্রথম দলটি বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের যে ধরনের ভূমিকা থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণকে অনেকটাই হতাশ করেছে। জাতীয় সংসদ ছিল অনেক সময় বিরোধী দল শূন্য এবং অকার্যকর। বিরোধীদলগুলো ছিল শুধু নামমাত্র এবং সংসদ অধিবেশন বর্জন ছিল নিয়মিত ব্যাপার। সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো যেমন বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ক্ষমতাসীন সরকারি দলগুলোও ব্যর্থ হয়েছে বিরোধী দলগুলোকে সংসদে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে।

Scanned by CamScanner

১৯৯১ সালের পরে বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো :

১. **সংসদ বর্জন :** ১৯৯১ সালে ক্ষমতাসীন ছিল বিএনপি এবং বিরোধী দল ছিল আওয়ামী লীগ। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদের মোট ৪০০ কার্যদিবসের মধ্যে আওয়ামী লীগ উপস্থিত ছিল মাত্র ১৩৫ দিন। তার পরের সংসদে অর্থাৎ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল বিএনপি। অথচ বিএনপিও পূর্বের বিরোধী দলের মতো মোট ৩৮২ কার্য দিবসের মধ্যে সংসদে উপস্থিত ছিল ১৬৩ দিন। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরের সংসদে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সংসদে উপস্থিত ছিল মোট ৩৭৩ কার্যাদিবসের মধ্যে ১৫০ দিন। এর পরে নবম সংসদ ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পূর্বের সংসদগুলোর সব রেকর্ডকে অতিক্রম করে। ঐ সংসদে বিরোধী দল বিএনপি মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে কেবল ৭৬ দিন উপস্থিত ছিল। বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত ছিলেন কেবল ১০ দিন। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের পর সবচেয়ে কম উপস্থিতি।

২. **বিরোধিতার জন্য সমালোচনা :** সংসদ কার্যকর হয় বিরোধী দলের উপস্থিতি ও গঠনমূলক আলোচনায়। সরকারের প্রশংসনীয় কাজে বিরোধী দল একাত্মতা ঘোষণা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারকে উৎসাহ যোগাবে এবং নিন্দনীয় কাজে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করবে। এতে দেশ ও জনগণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে যে দল যখনই বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তখনই তারা সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু সমালোচনাই করেছে। ক্ষমতাসীন দলের শুধু বিরোধিতা করাই যেন তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **দেশের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ :** বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সরকারের সমালোচনা করা হলেও দেশের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অধিকাংশ সময়ই তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সরকারের বিরোধিতার মুখ্য বিষয় ছিল ব্যক্তিগত কারণ কিংবা দলীয় কারণ। জনস্বার্থ বিষয় নিয়ে এখন পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো তেমন সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

৪. **একই দলের বারবার বিরোধী দল হওয়া :** ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কোন দল টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসেনি। এ সময়ের মধ্যে ষষ্ট সংসদ [যার মেয়াদ ৩০ দিনের কম] ছাড়া আওয়ামীলীগ দুবার ও বিএনপি দুবার ক্ষমতায় এসেছে । দেখা যায়, এ দু দলই বারবার ক্ষমতাসীন এবং সংসদের বিরোধী দল ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো দলের প্রতি দেশের জনগণ আস্থা না রাখতে পারার কারণেই বার বার ক্ষমতার এই পালাবদল ঘটেছে।

৫. **বিরোধী দলের উপর সরকারের দমন পীড়ন :** বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের পর থেকে সরকারি দল কর্তৃক বিরোধী দলের উপর দমন পীড়নের হার বেড়ে গিয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যেন একে অপরের জাত শত্রু। যে দলই ক্ষমতায় গিয়েছে সে দল-ই বিরোধী দলের সদস্য-সমর্থকদের উপর দমন নিপীড়ন চালিয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে হাজার হাজার মামলা দিয়ে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে রাখার মতো ঘটনা সংসদের প্রতি মেয়াদেই ঘটছে। এমনকি মানব বন্ধন, সংবাদ সম্মেলন, মিছিল মিটিং পর্যন্ত করতে বাধা দেয়া হয়।

৬. **বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি :** বাংলাদেশে যে দলই বিরোধী দল হিসেবে থাকুক না কেন সে দলই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করেছে। কোনো কিছু ঘটলে কিংবা দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে বিরোধী দল হরতাল আহবান করে দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। গাড়ি ভাংচুর, গাড়িতে অগ্নি সংযোগ, অবরোধ প্রভৃতি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে, তেমনি অনেক হতাহতের মতো ঘটনাও দেশকে পঙ্গু করে দেয়। ১৯৯১ সালে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু হলেও বিরোধী দলগুলো এখনো ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা যতটা না ইতিবাচক তার চেয়ে বেশি নেতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রায় বিরোধী দলগুলো থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পাওয়ার আশা থাকলেও কার্যত সংসদ ও সংসদের বাইরে বিরোধী দলগুলো তেমন সক্রিয় ভূমিকা দেখাতে পারেনি। বরং দিন দিন ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। দেশের স্বার্থে এমন বৈরী অবস্থার অবসান এখন থেকেই দরকার।

বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জরুরি বিধানাবলির সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ আইনের অপপ্রয়োগ করছে। জাতীয় সঙ্কটময় মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দন্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থে রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে এ আইনে নিবর্তনমূলক আটক অবাঞ্ছিত।

Scanned by CamScanner

রুলস অব বিজনেস :

রুলস অব বিজনেস হলো সরকারি কার্যবিধিমালা। অর্থাৎ যে দলিল অনুযায়ী (কার্য বিধিমালা) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি বণ্টন করা হয় এবং কে, কোন দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে পালন করবে, কোন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি কিরূপ হবে তা নির্ধারণ হয় তাকেই বলা হয় রুলস অব বিজনেস। রুল্‌স অব বিজনেস মূলত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় এবং সেই সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত রাখে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি 'রুলস অব বিজনেস' সংশোধন করতে পারেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান?

মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যেসব সংস্থার প্রধান :

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক;
২. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;
৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
৪. বাংলাদেশ স্কাউট;
৫. এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা :

সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দূর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রীতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে করে তাদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস :

বাংলাদেশ সচিবালয় প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়ে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। সচিবের কাজে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সচিব থাকেন। মন্ত্রণালয়ের এক একটি অনুবিভাগের জন্য একজন যুগ্ম সচিব, একাধিক শাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব এবং প্রতি শাখার দায়িত্বে একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব বা সহকারী সচিব থাকেন। সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে : মন্ত্রী → সচিব → অতিরিক্ত সচিব → যুগ্মসচিব → উপসচিব → সিনিয়র সহকারী সচিব → সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক?

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার নারীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করেছে। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। পৌরসভা নির্বাচনেও সে রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন নারীদের দাবি ও সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। এতে নারীরা প্রশাসনে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নারীর সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন :

বাংলাদেশে বর্তমানে এক কেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থা (Unitary form of government) প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকার প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীকে তার কাজে সহযোগিতা করে। সচিবগণ মন্ত্রণালয় বা একটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ ৪২টি মন্ত্রণালয় রয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে গোটা দেশকে ৭টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একজন বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সাতটি বিভাগের অধীন মোট ৬৪টি জেলা আছে। একজন উপ-কমিশনার (Deputy Commissioner) জেলার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার অধীন ৪৮৯টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ :

বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত। জেলা তিনটি হলো রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। এ জেলা তিনটির সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' বিল জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করে আইনে পরিণত করা হয়। ১৯৮৯ সালে ৬ মার্চ এ বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এ আইনের লক্ষ্য হলো: ১. উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ২. প্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা। ৩. উন্নয়নমূলক কাজে উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যাবলি : ১. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।
২. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন।
৩. স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন।
৪. কৃষি, বন, মৎস্য ও সমাজকল্যাণ।
৫. ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংগঠন ও সংরক্ষণ করা।

পরিষদের ক্ষমতা :

১. পুলিশ : সহকারী সাব-ইনসপেক্টর অব পুলিশ এবং তার অধস্তন সকল পুলিশ কর্মকর্তা পরিষদ নিয়োগ করবে এবং দায়িত্বের ব্যাপারে পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে।
২. ভূমি হস্তান্তর : পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো জায়গাজমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এরকম কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।
৩. বিরোধের অবসান : সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় হেডম্যান তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ :

কোনো দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ তার ক্ষমতার অবস্থান ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প হতে পারে- প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে এ উভয় অবস্থাই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনার প্রধান্যের ফলে বিকেন্দ্রীকরণই তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ডুয়াইট ওয়ালডো (Dweight Waldo) বলেন, বিকেন্দ্রীকরণ বলতে স্থানীয় কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দায়িত্বকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থার নিকট হস্তান্তরকে বোঝায়।

Prof. Allen- এর মতে 'কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন ক্ষমতা ব্যতীত অপর ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।'

সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নতর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরি বলে বিবেচিত হয়।

Scanned by CamScanner

পিএটিসি (PATC) :

Public Administration Training Centre (PATC) বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কর্ম কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশবলে সাবেক Bangladesh Administrative Staff College (BASC), National Institute of Public Administration (NIPA), Civil Officers Training Academy (COTA) এবং Staff Training Institute (STI)- এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, যা PATC নামে পরিচিত। ঢাকার অদূরে সাভারে PATC 'র অবস্থান। এর প্রধান হলেন রেক্টর, যিনি একজন সচিব পদমর্যাদার সমতুল্য। PATC 'র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।

উপজেলা পরিষদ :

৭ নভেম্বর, ১৯৮২ থেকে কার্যকর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুর্নগঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রুপান্তরিত করা হয়। থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত (ক) সংরক্ষিত ও (খ) হস্তান্তরিত দুই বিষয়ে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয়কে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এবং তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেন। কর আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯২ সালের ২৬ জানুয়ারি উপজেলা বাতিল বিল পাস হয়। ১৯৯৬ সালে জাতীয় পাটির সমর্থনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর সংসদে উপজেলা বিল পাস করে। এ বিল পাসের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে বাতিল করা উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার দেশের সকল প্রশাসনিক থানাকে 'উপজেলা' হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। সর্বশেষ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৩০ জুন ২০০৮ রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুগম করে এবং ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়। চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে।

নির্বাচন কমিশন :

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন কমিশনার নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। নিয়োগকৃত কমিশনারদের কার্যমেয়াদ পাঁচ বছর।

নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ অসদাচরণ কিংবা দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন। তারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেও পদত্যাগ করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ দায়িত্ব পালনের পর অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তবে কমিশনের সদস্যগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যাবলি :

১. প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করা। ২. রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। ৩. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ করা। ৪. সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা। ৫. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ। যেমন- (ক) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্রের বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলে কমিশন উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। (খ) কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচনের পর তার সদস্যপদের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরিত হয় এবং কমিশন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (গ) এসব দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করে থাকে।

Scanned by CamScanner

নির্বাচনী আইন :

নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর কিছু কিছু ধারা সংশোধিত হয়ে বর্তমানে এই বিধিমালাগুলো যথাক্রমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০১৩, নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধনী) ২০০৮ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা ২০০৮ নামে পরিচিত। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইবিধান গঠিত।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল :

নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পর্যবেক্ষক দলসমূহের তদারকির কারণেই নির্বাচন আরো সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে তাদের সরব উপস্থিতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দলসমূহ কাজ করে যায়। পর্যক্ষেকগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে দেশের সম্মান অটুট রাখে এবং নির্বাচনকে গতিশীল করতে প্রভূত সাহায্য করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ফলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন আর নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সার্বিক প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম। সামরিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর তারা প্রায় সকলেই নিজেদের দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ হিসেবে জনগণের কাছে বিশ্বস্ত রাখতে চায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ সরকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনকি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। নির্বাচনের প্রয়োজন হলে তারা অনেকে জয়লাভ করার জন্য কারচুপির আশ্রয় নেন ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে তামাশার। সবধরনের নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সার্থক নির্বাচন প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি বিভিন্ন দেশ, সংস্থা পর্যবেক্ষক দলসমূহ প্রেরণ করেন। তারা সরেজমিনে নির্বাচনের সার্বিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন সময়ে যেসব দেশ বা সংস্থা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন্স, জার্মানির পর্যবেক্ষক গ্রুপ, বিদেশি পর্যবেক্ষক মিশন, ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (VOTE), ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক টিম, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিনভিত্তিক এনডিআই, এশিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্থানীয় অনেক NGO পর্যবেক্ষক দলসমূহের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, ওয়েভ, খান ফাউন্ডেশন, ফেমা, জানিপপ, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা The Representation of the Peoples Order (RPO) হলো একটি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা। কোনো কোনো দেশে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আদেশ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে আরপিও এর সংশোধন হয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধিমালা তথা জাতীয় সংসদে পাসকৃত পূর্ণাঙ্গ আইন থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখানো পূর্ণাঙ্গ আইন তথা এ্যাক্ট হয়নি। বরং ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন। তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ বা অধ্যাদেশও আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ায় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদিত হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশও যে আইন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কয়েকবার এই আদেশটিকে এ্যাক্ট এ রুপান্তর করার চেষ্টা করা হলেও রাষ্ট্রপতির আদেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এর কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোরূপ সমস্যা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই আইনটি আদেশ নামেই বহাল রয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ইংরেজি রূপ হলো দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার যা সংক্ষেপে আরপিও নামে পরিচিত। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি বাছাইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালাই হলো আরপিও। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ায় এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও নামে পরিচিত। আর যদি জাতীয় সংসদে এটি পাস হতো তাহলে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিতি পেত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই বিধিমালাটি আরপিএ নামে পরিচিত।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা এই আদেশনামাটি ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটিতেই আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

Scanned by CamScanner

Student Work

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা সমূহ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তির নির্বাচনে না আসা। অধিকাংশ অযোগ্য লোক নির্বাচনে আসে এবং তারা অর্থের জোরে, পেশী শক্তির জোরে, পারিবারিক ঐতিহ্যের জোরে নির্বাচনে জয়ী হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় সরকার কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অপারগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাছাড়া দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বহীনতা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক বলে বিবেচিত। নিচে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি :** সরকারি সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করাই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ সরকারি বণ্টনব্যবস্থাকে রাজনীতিকীকরণের ফলে স্থানীয় সরকার পরিণত হয় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট আর অব্যস্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃবর্গ তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেন। যথা : বিভিন্ন টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান; হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ঘাট প্রভৃতি নিজেদের লোকদের ইজারা প্রদান; বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান প্রভৃতি।

২. **উপদলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব :** বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে বিভিন্ন দল-উপদল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ সকল দ্বন্দ্ব হলো সাধারণত উপজেলা চেয়াম্যান ও সাংসদদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজেদের মধ্যে।

৩. **জনগণের অংশগ্রহণের অসারতা :** স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবতা উল্টো সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

৪. **স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর :** বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তারা এতে ব্যর্থ হয়। তারা উন্নয়নমূলক কার্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারেনি।

৫. **নির্বাচনী গণতন্ত্রের অপমৃত্যু :** ১৯৮৫, ১৯৯০ ও ২০০৯ সালে দেশে তিনটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের চেয়ে সন্ত্রাস, কারচুপি, ব্যালট বাক্স চুরি প্রভৃতিরই প্রধান্য ছিল এবং নির্বাচন উপহাসে পরিণত হয়েছিল। সর্বশেষ চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও সরকারি দলের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **গ্রামীণ টাউটদের উৎপত্তি :** বিকেন্দ্রীকরণের নামে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি অফিস-আদালতে জনগণের প্রবেশের পথ মোটেও সুগম হয়নি। বরং একে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় এক শ্রেণীর টাউটের উৎপত্তি হয়, যারা জনগণের হয়ে এসব অফিস-আদালতে ধন্না দেয় এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে।

৭. **মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণতি :** বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদ্দেশ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন জনগণের অতি সাধারণ বিষয়েও মামলা-মোকদ্দমা করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীরা অহেতুক তাদের বিরোধীদের হয়রানির জন্য এ সুযোগ কাজে লাগায়।

৮. **সমন্বয়ের অভাব :** স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব থাকে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করে।

৯. **অমনোযোগী নেতৃত্ব :** স্থানীয় সরকারের নেতারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিও তেমন মনোযোগী হন না। তাদের অধিকাংশই রাজধানী কিংবা জেলা শহরগুলোতে অবস্থান করেন। ফলে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজখবর কমই রাখতে পারেন।

১০. **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের আঞ্চলিকতা :** উপজেলা উন্নয়ন কমিটির মিটিংয়ের সময় চেয়ারম্যানরা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এতে সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্য দেখা দেয়।

রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ১৯৭০-১৯৮০ দশক-পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে পৃথিবীব্যাপী যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের খুব বেশি আধুনিকায়ন হয়নি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। তাই রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং ক্ষমতার স্বচ্ছ বণ্টন প্রদানপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ যুগোপযোগী করে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করলে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হবে।

Scanned by CamScanner

Student Work

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সাফল্য ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা

গণতন্ত্র

Democracy শব্দটি ২টি গ্রীক শব্দ demos (People) এবং kratos (rule) থেকে এসেছে ঐহিহাসিক হেরোডেটাস, "ইহা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণী সমূহের ওপর ন্যস্ত থাকে না বরং সমাজের সদস্যগণের ওপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে।" C. F. Strong বলেন, "Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed" (শাসিত গণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা যায়)

গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের উপর, যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনগণের প্রতিনিধিরা, যারা নির্বাচিত হন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের (Democracy is a government of the people, by the people and for the peopole) মর্মবাণীই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল এবং একমাত্র উপজীব্য বিষয়। মূলতঃ গণতন্ত্র হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সরকারব্যবস্থা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মত ও চিন্তার উদারনৈতিক স্বাধীনতা, নির্বাচনে শাসক দল পরাজিত হলে বিজয়ী দলের হাতে দ্বিধাহীন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, সংখ্যালঘিষ্ঠের সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকারব্যবস্থা, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের ওপর, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনগণের প্রতিনিধিরা, যারা নির্বাচিত হন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়

বাংলাদেশ সহ যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সরকারী ও বিরোধীদলের সমগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রাজনৈতিক দল বলতে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সব দলকেই বোঝানো হয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সরকারী দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো –

ক। **সরকারী দলের করণীয় ঃ** সরকারী দল গণতন্ত্রের সফলতার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে –

০১। **নাগরিক অধিকার সমোন্নত রাখা ঃ** সরকার নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিত করবে। কোন অবস্থাতেই জনগণের নাগরিক অধিকার হরণ করা বা বিঘ্নত করা যাবে না। নাগরিক অধিকার নাগরিককে দেশ তথা সরকারের প্রতি অনুগত ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে এবং গণতান্ত্রিক আচরণের অভ্যস্ত করে তুলে। অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের কাছে সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রত্যাশা বাতুলতা।

০২। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** সরকারের পবিত্রতম দায়িত্ব হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ দাড়ায় সরকার পরিচালিত হবে দেশের সংবিধান অনুযায়ী। মনগড় কোন বিধান, কোন প্রকার অনুরাগ বা বিরাগ জনিত কোন নীতি, বিশেষ মতবাদ, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি নয়- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলকথা হল ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন। বাংলাদেশেসহ এশিয়ার উন্নয়শীল দেশ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষনীয় এবং এ সকল অঞ্চলে গণতন্ত্র ভঙ্গুর ও দুর্বল।

০৩। **দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন ঃ** সরকার নির্বিশেষে সকল জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। সেলক্ষ্যে সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এর বড় অভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিটি সরকার এক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকল্প জনকল্যাণ মুখী না হয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়ে থাকে।

০৪। **দেশের জনগণকে সকল দুর্যোগ থেকে মুক্তরাখা ঃ** জনগণের জান মালের হেফাজত সরকারের দায়িত্ব। এছাড়া কোন দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রে সরকার জনগণের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অথবা মনুষ্য সৃষ্ট কোন প্রতিকূল অবস্থায় সরকার জনগণের পাশে থাকবে।

০৫। **দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে দেশ পরিচালনা ঃ** দুর্নীতি বাংলাদেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্র এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে এর থেকে মুক্ত হওয়া যে কোন সরকারের পক্ষেই দুরুহ বিষয়। দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ণে এর দুর্নীতি দমনের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্রে দেশের পরিচালনায় দায়িত্ব যেহেতু জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকারের। সরকার যদি দুর্নীতিগ্রস্থ হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলো দলীয় করণ ও দুর্নীতির মধমে ধংস করে ফেলে।

Scanned by CamScanner

০৬। **সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ঃ** বাংলাদেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সংসদ বর্জন একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। সরকারে তরফে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য, কাদাছুড়াছুড়ি প্রভৃতি কারণে বিরোধীদল সংসদে থাকছে না। বিরোধী দলহীন নিষ্প্রাণ সংসদে সরকার তার ইচ্ছা মাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

০৭। **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঃ** গণতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে সকল কু-প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যাতে করে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকে, বিশ্বাসযোগ্য ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উনুষ্ঠান, গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক সংলাপের ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সরকারের দয়িত্ব।

০৮। **নমনীয়তা ঃ** সরকারী দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়েই নয় বরং তাদের ও বিরোধীদল উভয়কে নিয়েই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার। সুতরাং সরকারী দলকে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, হতে হবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে জনগণের কাছে। আর তাই সরকারী দলকে অনেক বেশী নমনীয় হতে হবে।

০৯। **দমননীতি পরিহার করা ঃ** বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, নির্বাচনোত্তর সরকারী দল বিরোধী দলের উপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে থাকে, যা গণতন্ত্রেরসাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে যেমন সরকারী দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তেমনি গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘাত ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

১০। **একচেটিয়াত্ব বর্জন করা ঃ** বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, নির্বাচনে জয়লাভকারী দল সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয় যা গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারী দল গণতন্ত্র হতে বহু দূরে সরে যায়।

খ। **বিরোধী দলের করণীয় ঃ** বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরোধী দলসমূহকে নিম্নোক্ত দায়িত্বশীল বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে –

০১। **গঠনমূলক সমালোচনা ঃ** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা হয়। এ দলের প্রধান কাজ সরকারী দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা।

০২। **বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয় ঃ** বিরোধী দল বলেই বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারী দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতে ও উৎসাহিত হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

০৩। **সংসদ বর্জনের সাংস্কৃতি পরিহার ঃ** বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরোধীদল বরাবরই সংসদে অনুপস্থিত থাকছেন। তাদের মত প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া, সরকার দলের সংসদ সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন বিরূপ ও অশালীন বক্তব্য- নানা কারণে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে আসছে। এর ফলে তারা তাদের নির্বাচনী এলাকা তথা নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দেশের জন্য সংসদে কথা বলতে পারছেন না। জনগণ অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।

০৪। **জনমত সৃষ্টি ঃ** বিরোধীদলের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হিসেবে অপরাপর রাজনৈতিক দলও সরকারের কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পলিছি, মূল্যবোধ, আদর্শ পৃভৃতি বিষয় তুলে ধরবে এবং আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে তারা অবদান রেখে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখবে ও জনমত সৃষ্টি করবে।

০৫। **মুক্তিগ্রাহ্য দায়িত্বশীল যুক্তিতর্ক ঃ** দলীয় নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা আনায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরোধীদল "জাতীয় সংলাপ" পরিচালনা করবে যা রাজনীতিকে উন্নততর উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে।

০৬। **সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ঃ** গণতন্ত্রের প্রাণ হল জনগণ। বিরোধী দল সবসময় সাধারণ জনগণ ও ভোটের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

০৭। **পর্যবেক্ষণ ঃ** বিরোধীদল সরকারের সকল বিষয়ের পর্যবেক্ষণ করবে এবং জনগণের কাছে তার ভুল-ত্রুটি ও সমালোচনা তুলে ধরবে।

০৮। **বিকল্প উপস্থাপন ঃ** বিরোদীদল সকল বিষয়ে সুবিধা জনক সম্ভব্য বিকল্প জনগণের নিকট উপস্থাপন করবে। তারা নির্বাচিত হলে জনগণের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের কি কি বিকল্প ধারণা, নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করবে তা প্রচার করবে।

০৯। **ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের ভূমিকা ঃ** বিরোধীদল ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করবে। নেতৃত্ব গঠনের জন্য ছায়ামন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এতে দেশ দক্ষ নেতৃত্ব পাবে, গণতন্ত্র আরো মজবুত হবে।

Scanned by CamScanner

১০। **রাজনৈতিক সংস্কৃতি শক্তিশালীকরণ ঃ** এ উদ্দেশ্যে বিরোধীদল দলের ভেতরে ও বাইরে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতির পূর্ণ চর্চা করবে। এ উদ্দেশ্যে বিরোধী দল উন্মুক্ত আলোচনা, দলের অর্থনৈতিক হিসাবের সচ্ছতা আনায়ন, সভা-সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করবে।

১১। **যোগাযোগ ঃ** বিরোধীদল নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, সামাজিক সংগঠন যারা ভোটার তালিকা প্রণয়ন নাগরিক শিক্ষা ও নির্বাচনের সচ্ছতা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে।

১২। **গবেষণা ঃ** বিরোধীদল গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবৈতনিক প্রধান গবেষক (Unpaid Principal Researcher)-এর ভূমিকা পালন করবেন। তারা সরকারের ত্রুটি ও জনগণের জন্য তাদের করণীয় বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করবে।

গ। **অন্যান্য বিষয়সমূহ যাতে রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ঃ** সরকারী এবং বিরোধী দলকে সকল বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে বেশ কিছু গুণাবলীর চর্চা করতে হবে। আর এ সকল বিষয়য়ের উপর যথাযথ দক্ষতা অর্জনই পারে রাজনৈতিক দলসমূহকে জনগণের প্রতি প্রদত্ত আশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করতে। নিম্নে এ সকল বিষয়সমূহ আলোচিত হল –

১। **পরমসহিষ্ণুতা ঃ** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে পরমতসহিষ্ণুতা ও যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সফলতা ও বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। তাই বাংলাদেশের সরকারী এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

২। **ঐকমত্য অর্জন ঃ** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধীতা সহ্য করার মতো ধৈর্য্য ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারী দল বিরোধী দলের মতামতের তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে বিরোধী দল শুধু বিরোধীতা করার স্বার্থে সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো থেকে বিরত থাকে। তাই উভয়কেই আরো সহনশীল হতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ঐকমত্যে পৌছাতে হবে। তবেই সত্যিকারের গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া যাবে।

৩। **সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা ঃ** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারী এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে বিরোধী দলের কোন যৌক্তিক দাবী অগ্রাহ্য করা যাবে না বরং বিরোধী দলকে জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪। **আপোষকামী মনোভাব ঃ** গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে আপোষকামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৫। **কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করা ঃ** সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলসমূহকে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করে গঠনমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিতে হবে।

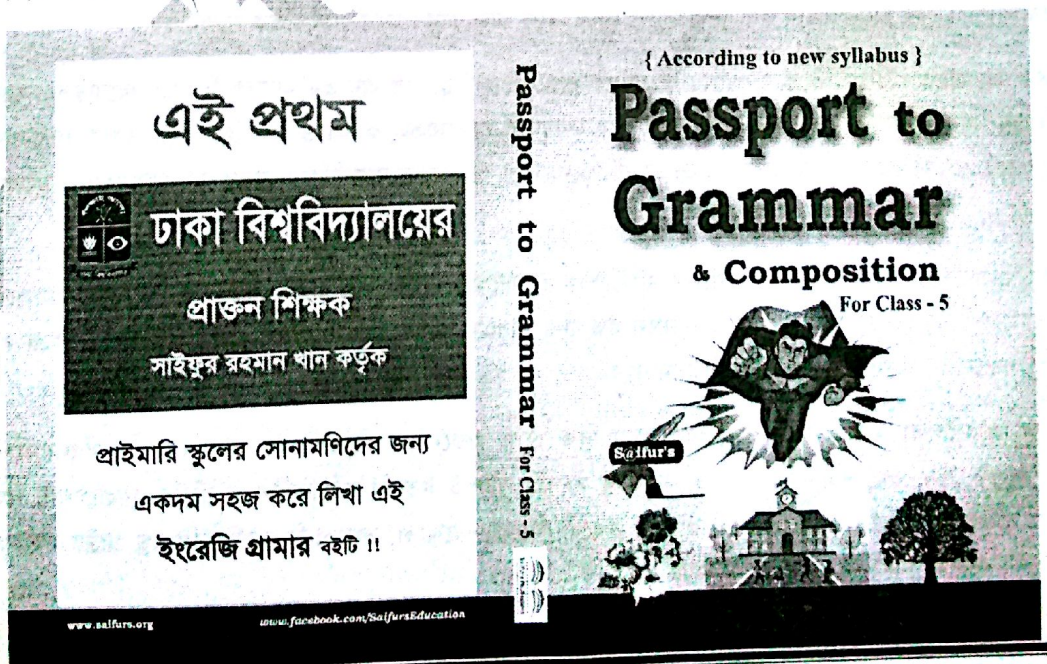

Scanned by CamScanner

Student Work

বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

অথবা, বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাদের অবদান :
অথবা, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্র :
অথবা, 'আমলারা উন্নয়নের ধারক ও বাহক।'- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটির ব্যাখ্যা :

আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়। আধুনিক জটিল বিশ্বে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এ আমলাতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বর্তমানকালের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে আমলাতন্ত্র এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র ছাড়া প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এহেন ধারণা সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনকি সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো-

ক. রাজনৈতিক উন্নয়ন : আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, শিল্পায়িত সমাজ প্রতিষ্ঠা, জাতিভিত্তিক রাষ্টপরিচালনা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো রাজনৈতিক উন্নয়নের মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক উন্নয়নের এসব মানদন্ড নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে থাকে। নিচে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচন করা হলো-

১. **আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ :** বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আর আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমলারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনসভার সদস্যদের সহযোগিতা করে থাকে। ফলে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ সহজ হয়। প্রকারান্তরে রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২. **রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ :** সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রশাসন পরিচালনা, জনগনের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি দিকগুলো রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পরিচায়ক। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ আমলারা রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কখনো সরকারের সাথে আবার কখনো জনগণের সাথে মিশে কাজ করে। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন হয়।

৩. **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :** রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করে যেমন- ভোটদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়।

৪. **রাজনৈতিক যোগাযোগ :** বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে রাজনৈতিক সামগ্রিক ব্যবস্থাকে সচল করে রাখে। কূটনীতি, বৈঠক, বিনিয়োগ, আন্তঃবিভাগীয় ডকুমেন্টস লেনদেন ইত্যাদির মাধ্যমে আমলারা রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পন্ন করে থাকেন। আর রাজনৈতিক যোগাযোগ রাজনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক উন্নয়নের কাম্য দিক হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর, খুন, গুম, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, সরকারি সম্পত্তি লুটপাট ইত্যাদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। আমলারা এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সরকারি ও বিরোধী দলের সাথে কখনো কখনো সমঝোতা, সংলাপ কিংবা বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে।

Scanned by CamScanner

খ. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে কোনো দেশের কাম্য পরিবর্তন আনয়নই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমলাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক বলা হয়। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো -

১. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন :** বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। আর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উর্ধ্বতন আমলাদের দ্বারা গঠিত। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের উপর ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের আমলারা তাদের বিচক্ষণতা, দক্ষতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে।

২. **বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহিত :** বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতির চাকাকে ধাবমান ঘোড়ার মত সামনের দিকে অগ্রসরমান করে। বাংলাদেশের আমলারা তাদের সুনিপুন দক্ষতা দিয়ে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিনোয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে বিদেশিদের আকৃষ্ট করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. **শুল্ক ও রাজস্ব আদায় :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো শুল্ক ও রাজস্ব আদায়। আদায়কৃত শুল্ক ও রাজস্ব দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় করে থাকে। আর জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করে সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে আমলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৪. **বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ফলে এদেশে প্রচুর বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে আমলাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেননা আমলারা বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের সাথে যোগাযোগ করে বৈদেশিক ঋণ আদায় করে থাকে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকেও আমলারা তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তি পরবর্তী সময়ে তার যথোপযুক্ত বিলিবণ্টনের ব্যাপারেও সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে।

৫. **আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ :** আর্থিক খাত তথা ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি খাতগুলোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উপর কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পরিক্ষীত ও অভিজ্ঞ আমলারা দেশের আর্থিক খাতগুলোর জন্য উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

গ. **সামাজিক উন্নয়ন :** দেশের সামাজিক অবস্থাকে ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর করাই সামাজিক উন্নয়ন। নিচে সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **সামাজিক সংস্কার :** বাংলাদেশে শিক্ষার হার কাঙ্ক্ষিত নয়। ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিক্ষেত্রে নানাবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান। এ সকল কুসংস্কার দেশের সামাজিক উন্নয়নে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিধায় আমলারা কুসংস্কার দূর করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে। যেমন-চিকিৎসাক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক রোধ, শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ, সংস্কৃতির নামে নগ্ন ও বেহায়াপনা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি।

২. **উন্নত জাতি গঠন :** উন্নত জাতি দেশের সামাজিক উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন শিল্প, সংস্কৃতি, যাতায়াত, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নয়ন। আমলারা বাংলাদেশের উন্নয়নের বাহক হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে উল্লিখিত দিকগুলোর উন্নয়ন ঘটায়। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, কর্মোদ্দীপনা ও দক্ষতা আমলারা কাজে লাগায়।

৩. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** উন্নত জীবনযাত্রার সূচক সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশ করে। বাংলাদেশের আমলারা পরিকল্পনামাফিক শিল্পায়ন ও নগরায়নের লক্ষ্যে যুযোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন ঘটে এবং কর্মের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **তথ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়ন :** তথ্য ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে যে সমাজ যত বেশি এগিয়ে সে সমাজ তত বেশি উন্নত। বাংলাদেশের আমলারা অন্যান্য দিকের মতো তথ্য প্রযুক্তির দিক দিয়েও বেশ দক্ষ। শিক্ষা, প্রশাসন, চিকিৎসা, আইন-আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ করে আমলারা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৬. **সংস্কৃতির বিকাশ :** বাংলাদেশের আমলারা উন্নত সংস্কৃতির বাহক। তারা দেশের স্বার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ সফর করে থাকে। সফরকালে তারা বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পরে তারা দেশে ফিরে তাদের সঞ্চিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা দেশের সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করে। ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র উন্নয়নের প্রকৃত ধারক ও বাহক। কেননা আমলারা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে। তবে আমলাদের ভূমিকার যথার্থতা নির্ভর করে তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর। কারণ আমলারা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই আমলাদেরকে চতুরতার সাথে উন্নয়ন কাজে নিমগ্ন হতে হয়।

Scanned by CamScanner

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা The Representation of the Peoples Order (RPO) হলো একটি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা। কোনো কোনো দেশে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আদেশ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন সময়ে জাতী সংসদে পাস হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে আরপিও এর সংশোধন হয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধিমালা তথা জাতীয় সংসদে পাসকৃত পূর্ণাঙ্গ আইন থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণাঙ্গ আইন তথা এ্যাক্ট হয়নি। বরং ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন। তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ বা অধ্যাদেশও আইনের স্বীকৃত হওয়ায় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদিত হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশও যে আইন তা নিয়ে কোনো তির্ক নেই। কয়েকবার এই আদেশটিকে এ্যাক্ট এ রুপান্তর করার চেষ্টা করা হলেও রাষ্ট্রপতির আদেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এর কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোরুপ সমস্যা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই আইনটি আদেশ নামেই বহাল রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) কি : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ইংরেজি রূপ হলো দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার যা সংক্ষেপে আরপিও নামে পরিচিতি। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি বাছাইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালাই হলো আরপিও। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ায় এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিও নামে পরিচিত। আর যদি জাতীয় সংসদে এটি পাস হতো তাহলে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিতি পেত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই বিধিমালাটি আরপিএ নামে পরিচিত।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা এই আদেশনামাটি ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটিতেই এটি আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ যে ধারাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে মূল ধারাগুলোর বর্ণনা :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারা বলে নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১২ (১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটানিং অফিসারের উপর অর্পিত হয়েছে। ১৬ (১) ও ১৬ (২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিসের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। আদেশের ১৭ (১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে।

২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮ ধারায় (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোষ্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭(৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯ (১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। ৪৪(ক) ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিবেন। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪ (ক) ও ৪৪ (খ) এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহবান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোট প্রদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধাদান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

আরপিও এর ৮৪ ধারায় আরো উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন।
৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যে কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১(খ) ধারাবলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা নামে দুটি বিধিমালা প্রণয়ণ করে।

Student Work | বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি

রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টির ব্যবহার খুব প্রাচীন না হলেও এর ধারণা গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ প্লেটো এবং এরিষ্টটলের লেখায় উল্লেখ রয়েছে। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত The Republic গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, Government vary as the disposition of men vary। এরিষ্টটল রাজনৈতিক কর্ম- কৌশলের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন। তা ছাড়া মন্টেস্কু, মেকিয়াভেলী, রুশো প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদও তাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন প্রথা ও রীতি-নীতি, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও আচরণের কথা বলতে গিয়ে প্রকারান্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথাই বলেছেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি :
রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টি গ্যাব্রিয়েল এ.এলমন্ড ১৯৫৬ সালে জার্নাল অব্ পলিটিক্স-এ (ভলিউম ১৮)-এ প্রকাশিত তাঁর লেখা Comparative Political Systems শীর্ষক নিবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রথম ব্যবহার করেন। ইতঃপূর্বে এ প্রত্যয়টি বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রচ্ছন্নভাবেই কেবল বিদ্যমান ছিল। অনেকে মনে করেন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়টির উন্নয়ন শুরু হয় ম্যাক্স ওয়েবারের লেখার মাধ্যমে। সাম্প্রতিককালে ল্যারি ডায়মন্ড রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন :

১. **প্রথম পর্যায় :** এ সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধ্যয়ন মূলত মনোগত ও নৃবৈজ্ঞানিক পর্যায়েই সীমিত ছিল। রাজনৈতিক সংস্কৃতি অধ্যয়নের এ পর্যায়ে হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, রুথ বেনিডিক্ট, মার্গারেট মিড এবং এরক ফ্রোম-এর বিভিন্ন লেখায় এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

২. **দ্বিতীয় পর্যায় :** ল্যারি ডায়মন্ডের মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল মূলত Cultural and Personality School-এর মনোজাগতিক ও নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। এ পর্যায়টি ১৯৫০-এর দিকে শুরু হয়ে সত্তরের দশকব্যাপী প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তিন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

   ক) **সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- i) যে সমাজে তা বিদ্যমান সেখানে স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক কাঠামো নেই। একই কাঠামোর মাধ্যমে বহুসংখ্যক কার্য সম্পন্ন হতে পারে। ii) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের জনসমষ্টি সরকারের দায়িত্বশীলতা অথবা জনগণের দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রকার সাড়া জ্ঞাপন করে না।

   খ) **অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলঃ i) যে সমাজের জনসমষ্টি সাধারণভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষবস্তু রূপে পরিগণিত হয়। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ হয় অত্যন্ত সীমিত। ii) ঐ সমাজে প্রবর্তিত নীতি বা কর্মপদ্ধতি জনসমষ্টির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়। অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনা বা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকা হয় অত্যন্ত গৌণ।

Scanned by CamScanner

গ) **অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসমষ্টি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকালে সরকারি নীতি গ্রহণ করতেও পারে অথবা প্রত্যাখ্যান করতেও পারে। এর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল স্তরে নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা ।

৩. **তৃতীয় পর্যায় :** ল্যারি ডায়মন্ডের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় আশির দশকে। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন শুরু হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরোধীদের অবস্থানও ক্রমান্বয়ে ম্লান হতে থাকে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ :

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কটা মূলত পারস্পরিক সম্পর্ক। সাধারণত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কোনো দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। নাগরিকদের রাজনৈতিক মাত্রাবোধ ও মূল্যবোধের প্রতীক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের ভেতর ঐকমত্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সপক্ষের শক্তিকে জোরালো করে। অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কাঠামোগত চরিত্র নিয়ে জনগণের ভেতর মতানৈক্য সরকারের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সরকারি ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। জনগণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার ও অংশগ্রহণ করতে পারে বলে কতটুকু তা অনুভব করে তা-ও রাজনৈতিক কৃষ্টির অন্যতম মৌলিক দিক।

১. **সমাজ ও পরিবারের প্রভাব :** সামাজিক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিকাশের প্রাথমিক স্তর হল পরিবার। পারিবারিক পর্যায়ে কর্তৃত্ব সম্পর্কে শিশুর ধারণা পরিণত বয়সে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। জীবনের সূচনালগ্নে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণ পরিণত বয়সে তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও মিথস্ক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। ফলে সক্রিয় রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়।

২. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব :** পারিবারিক পর্যায়ে শিশুর আত্মীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসগুলোর বিকাশ কিংবা এর বিপরীতে নতুন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র পারিবারিক গন্ডির বাইরে ব্যক্তির বৃহত্তর ভূমিকা, নাগরিক দায়িত্ববোধ, অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সম্পর্ক, মতামত, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মবিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির গঠনে ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা যায়।

৩. **পোষক ও অনুগতের সম্পর্ক :** ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়াও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মতো পশ্চাৎপদ সমাজে পোষক-অনুগতের সম্পর্ক বিদ্যমান। সামাজিক সম্পর্কের এ অবস্থা আবার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। পোষক-অনুগতের এ সম্পর্ক রাজনৈতিক দলে পরিব্যপ্ত হলে রাজনৈতিক দল কাঠামোগতভাবে শিথিল হয়ে পড়ে। এ ধরনের শৈথিল্য থেকে সৃষ্টি হয় উপদলীয় কোন্দল। তা থেকে সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে। ক্ষমতার বলয়ে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সংকীর্ণ ভিত্তিতে নিজেকে সংগঠিত করতে গিয়ে পোষকরা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের এ ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্র চর্চার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

৪. **জাতীয় গৌরববোধ :** গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হল জাতীয় গৌরববোধ। জাতীয় গৌরববোধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন প্রধান উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয় তখনই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের আস্থা গড়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকার ব্যবস্থার মধ্যে যত বেশি সুষম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত উন্নত হবে। শাসক-শাসিতের দূরত্ব ঘোচাতে পারলে বৈধতার প্রশ্ন কদাচিৎ উত্থাপিত হবে। নির্দিস্ট সময় অন্তর অন্তর নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষ দায়িত্বশীল প্রতিনিধি বেছে নিতে পারবে। বেশি লোককে বেশি বার বোকা বানানো যায় না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই মানুষকে সংস্কৃতিবান করে তোলে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অস্তিত্বের চিন্তা মানুষের সংস্কৃতি গঠনে প্রভাব ফেলে। যেমন ফেলে ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্তা এবং অর্থ-বিত্ত।

৫. **পারস্পরিক বিশ্বাস :** রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস। মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়। যখনই এলিটদের পারস্পরিক বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয় তখনই রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আস স্থবিরতা, অস্থিরচিত্ততা, পারস্পরিক কলহ, খুন-জখম। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে একদল অপর দলের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবকে হুমকি হিসেবে মনে করে। একে-অপরের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। সার্বক্ষণিক বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। বিরোধিতা ভাল। কিন্তু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা নয়। বিরোধিতা হবে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর এবং গঠনমূলক, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা- ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। নীতির প্রশ্নে আপোস নেই। সর্বজনীন কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সমঝোতা ও সহযোগিতা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচায়ক।

Scanned by CamScanner

৬. **পরমত সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ :** গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি স্বীকৃত। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ কাঙ্খিত। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের সকল মতামতই গ্রহণযোগ্য নয়, এমনটি কিন্তু যৌক্তিক নয়। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা বহাল রাখার জন্য সরকারি দল, বিরোধী দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময় রাজনীতির স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক, যা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচায়ক। সমঝোতা ও সহায়তার রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈধতার ভিত্তি নির্মিত হয়। রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সৌজন্যবোধ বিদ্যমান থাকলে অনৈক্য ও অসঙ্গতির মাঝেও সহযোগিতার পরিবেশ রাখা যায়। সেজন্য প্রয়োজন সংকীর্ণ মানসিকতা, আত্ম-স্বার্থ ও হীনমন্যতা পরিহার করে নিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির যথার্থ চর্চা।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি :

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য। কেননা গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হলো জনসমর্থন। এ সমর্থন আসে ব্যক্তির ইতিবাচক আত্মিক বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় থেকে যা কেবল ঐ জনগণের মধ্যেই পাওয়া যায়, যেখানে জনগণের মাঝে মূল্যবোধ ও স্বার্থের ঐক্য বিদ্যমান। মৌলিক বিশ্বাস ও স্বার্থের ঐক্য না থাকলে সমঝোতার ও সহযোগিতার অভাব দেখা দেয়। রাজনীতিতে জবরদস্তি ও সংহিসতা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ব্যক্তির মাঝে তার জাতীয় পরিচয়, জাতীয় স্বার্থ, গঠনতন্ত্র, মানবাধিকার, উন্নতি, অগ্রগতির, জাতীয় সংহতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। রাজনৈতিক এলিটদের এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

১. **অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব :** রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাবি পূরণের সক্ষমতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক না ও হতে পারে। এমন অবস্থায় রাজনৈতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে অরাজকতা দেখা দিতে পারে। জনগণ সমর্থন দানের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সমাজে কর্তৃত্বমূলক পরিবার কাঠামোতে গড়ে ওঠা শিশুর মাঝে স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য ও আত্মবিমুখতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় জাতীয় রাজনৈতিক বৃহত্তর পরিসরে। কেবলমাত্র ভোট দান ছাড়া জাতীয় রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। জনগণের সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজনীতি সম্পর্কে, রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকাংশই উদাসীন। ফলে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

২. **পোষক-অনুগতের সম্পর্ক বিদ্যমান :** দারিদ্র্য ও নিরক্ষতার কারণে সমাজ ব্যবস্থায় পোষক-অনুগতের সম্পর্ক বিদ্যমান, যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এ ধরনের সম্পর্ক এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে রাজনীতিতে দলাদলি, চরিত্র হননও সংঘঠিত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গডফাদার সেজে অন্তরাল থেকে অনুগতদের দিয়ে সকল প্রকার উদ্দেশ্যে হাসিল করা হচ্ছে। সহিংসতাই যে কোনো কিছু অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ বলে বিবেচিত। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আইনানুগ পদ্ধতি অনেকের কাছে হাস্যকর, বিদ্রুপাত্মক, দুর্বলতার পরিচায়ক। অপ্রকাশ্যে হলেও আজও কিন্তু দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের কথা আমরা বলি, নীতিবানকে সমীহ করি, ন্যায়বিচারকে উচ্ছসিত প্রশংসা করি।

৩. **ঐতিহাসিকভাবে শাসক বিরোধী মনোভাব :** দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাননামলে শাসকশ্রেণীর প্রতি সার্বক্ষণিক বিরোধিতার মনোভাব আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাজমান। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারগুলোর প্রতিও জনগণের সমর্থনের প্রকৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, জনমতের কোনো স্থিতিশীলতা নেই। সরকারের বিরোধিতা করাই তাদের প্রবণতা। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধিতা করার চেয়ে এখানে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেশি জনপ্রিয়। প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা, সরকার পরিচালনায় অব্যবস্থা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, দলীয়করণ, বেকার সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান, বিরাট অংকের বৈদেশিক ঋণ সাধারণ মানুষের হতাশা বাড়িয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন।

৪. **মূল্যবোধের অভাব :** আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে সৌজন্যবোধ আজ প্রায় নির্বাসিত রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক শিষ্টাচার সম্পর্কে অনভ্যস্ততা, নিরপেক্ষ মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের দায়িত্বশীলতা, সুষ্ঠু রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব, পরস্পরের প্রতি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করেছে। আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আজ নানাভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতীকের কাছে আমরা যাই। সেখানে গিয়ে প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করি। পরমুহূর্তে বিস্মৃত হই। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসযোগ্য প্রতীক হিসেবে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার, চার নেতার মাজার, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ইত্যাদির গুরুত্ব ও ভাবগাম্ভীর্য আছে। এসব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মূল্যায়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখে। পদ লাভের আগে ও পরে এসব সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করা উচিত নয়।

Scanned by CamScanner

৫. **সুষ্ঠু নির্বাচনী সংস্কৃতির দুর্বলতা :** প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়া সকলের প্রত্যাশা। নির্বাচন পরিচালনায় যেন পক্ষাপাতিত্বের কোনো অভিযোগ না থাকে এটা সকলেরই কাম্য। ভোটার যেন পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বধায়ক সরকার নির্বাচনকে নিরপেক্ষতার মোহর লাগিয়ে ভোটারদেরকে নিশ্চিত করতে পারে। তাহলে জনগণ মনে করবে যে রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ সার্থক হয়েছে। একবার প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে তা দেশে সর্বদা বহাল থাকবে। একবার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে নির্দিষ্টত সময় অন্তর অন্তর তা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নত। বাংলাদেশে পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা, ভালবাসা, পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশি। রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে মূল্যবোধে ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কম সমৃদ্ধ নয়। পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বর্ণনা-বিশ্লেষণ কোনো কিছুই স্থবির নয়। সংস্কৃতি মানেই প্রগতি, তবে একথা সত্য যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাই এর অনুরূপ সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়।

Student Work জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে বিরোধীদল

জনগনের নির্বাচিত জাতীয় সংসদের কাছে নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থার একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। এজন্য সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত দেশসমূহে আইনসভাকে সকল আলোচনার কেন্দ্রে দেখা যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও জাতীয় সংসদ কখনও আলোচনার কেন্দ্র হতে পারে নি।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বাস্তব অবস্থা :

বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রধান বৈশিষ্ট্য করে সংবিধান প্রণীত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিলের পর দ্বাদশ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। তবুও বিভিন্ন কারণে অতীত ও বর্তমান সকল সময়ই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ জনগণের আশা ও আকাঙ্খার তথা সকল প্রত্যাশার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে ব্যর্থ হয় এবং হচ্ছে। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলো :

ক) অধিকাংশ অধিবেশন বিরোধী দলহীন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়।
খ) সংসদীয় কমিটিগুলির তেমন কার্যকারিতা নেই।
গ) সরকার ও বিরোধীদল উভয়েই অসহিষ্ণু আচরণ করে।
ঘ) বিরোধী দলের সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকারের বিরোধিতা করতে দেখা যায় না।
ঙ) সংসদে অশ্রাব্য ভাষা, কুৎসা ও প্রতিহিংসামূলক বিতর্ক দেখা যায়।
চ) সরকারকে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংসদকে পাশ কাটিয়ে প্রায়শই আইন প্রণয়ন করতে দেখা যায়।
ছ) সংসদ সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের অনীহা লক্ষণীয়।

সংসদ হওয়া উচিত সবকিছুর প্রাণ কেন্দ্র :

সংসদ কার্যকর হওয়ার অর্থ হচ্ছে শাসন ও বিচারকার্যে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলন তথা সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত। সংসদ সদস্যরাও সভা-সেমিনারে এমন মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে নিচে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হলোঃ

ক) **কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ** সংসদকে সবকিছুর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা না গেলে সংসদীয় গণতন্ত্র তার কার্যকারিতা পাবে না। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের সুফল পেতে সংসদকে কার্যকর করা প্রয়োজন।

খ) **দায়িত্বশীল বিরোধী দল গঠন ঃ** সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

গ) **দায়িত্বশীল বিরোধী দল গঠন ঃ** সংসদ কার্যকর হলে আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলি আরো দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে।

ঘ) **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রোধ ঃ** সংসদে সরকার ও বিরোধী দল সংসদীয় আচরণ করলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।

ঙ) **সু-শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** কার্যকর সংসদ সু-শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করা প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner

চ) **সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ঃ** কার্যকর সংসদ না থাকায় দেশের সরকারের উপর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে সরকারের আচরণ মাঝেমাঝেই স্বৈরতান্ত্রিক পরিণত হয়।

ছ) **কার্যকর আইন প্রণয়ন ঃ** সংসদীয় কমিটিতে ও সংসদে আলোচনা হলে নতুন আইনের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে এবং জনগণের সার্বিক মঙ্গলে ভালো আইন প্রণীত হয়।

জ) **কার্যকর আইন প্রণয়ন ঃ** সংসদ হলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। ফলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

ঝ) **দুর্নীতি দমন ঃ** দুর্নীতিতে আমাদের দেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল। শক্তিশালী সংসদ এই লজ্জাজনক সমস্যা দূর করার প্রধান কেন্দ্র।

ঞ) **দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র না হওয়াতে সরকার ও বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারছে না। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।

ট) **আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঃ** বিরোধী দল সংসদীয় বিরোধীতার স্থলে রাজপথ বেছে নিলে সরকারকেও দমননীতি গ্রহণ করতে দেখা যায় যা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। তাই আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে সংসদ কার্যকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঠ) **সামরিক শাসনের ঝুঁকি হ্রাস ঃ** অকার্যকর সংসদ সামরিক অভ্যুত্থানের নিয়ামক। তাই সামরিক শাসনের ঝুঁকি এড়াতে সংসদকে সবকিছুর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা দরকার।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা :

আধুনিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিরোধী দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা নীচে আলোচনা করা হলো-

১) **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি ঃ** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকটময় মূহুর্তে বিরোধী দল দেশমাতৃকায় সেবার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। বিরোধী দলের এ ভূমিকা জাতীয় সমস্যা সমাধানে বেশ সহায়ক হয়।

২) **সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ ঃ** বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারী পথকে রুদ্ধ করে। সরকারি দল বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে স্বৈরাচারী হতে পারে না। ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকে।

৩) **সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা ঃ** বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। এতে জনরোষের ভয়ে সরকার অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য হয়।

৪) **জনমত গঠন ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, সভা-সেমিনার, হরতাল-অবরোধ প্রভৃতি উপায়ে তাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং ক্ষমতাসীন দলের দোষ-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরে। এভাবে বিরোধী দল নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

৫) **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা বিরোধী দলের একটি প্রধান কাজ। সমাজের অসংখ্য সমস্যা ও তার সমাধানের ব্যাপারে বিরোধী দল দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এর ফলে জনগণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলি এবং বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হয়।

৬) **সরকারি নীতি সংশোধনী ঃ** সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারের নীতি সংশোধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং ত্রুটিপূর্ণ ও জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে সরকার ভুল নীতিগুলো সংশোধন করতে বাধ্য হয়।

৭) **বিকল্প কর্মসূচি পেশ ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি পেশ করে থাকে। ফলে জনগণ একের অধিক কর্মসূচি থেকে যেকোনোটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ পায়।

৮) **ছায়া সরকার গঠন ঃ** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য ছায়া সরকার গঠন করে থাকে। এরূপ সরকারের চাপে ক্ষমতাসীন সরকার জনস্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ পরিহার করে জনকল্যাণমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

Scanned by CamScanner

৯) **গণতন্ত্র রক্ষা ঃ** সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল গণতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো কারণে সরকারের পতন হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে গণতন্ত্রের ধারার চ্যুতি ঘটে না।

১০) **জনগণকে সচেতন রাখা ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল জনগণকে সচেতন রাখে। সরকারি দলের কাজ হলো নীতি প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ। কিন্তু সরকার কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে বিরোধী দল রাজনৈতিক উত্তপ্ততা বজায় রাখে এবং জনগণকে সচেতন করে তোলে।

১১) **জনগণের অধিকার রক্ষা ঃ** জনগণের অধিকার রক্ষায় বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। অনেক সময় ক্ষমতাসীন সরকার স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য জনস্বার্থবিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সময় বিরোধী দল সমালোচনা, বিক্ষোভ প্রভৃতি কর্মপন্থার মাধ্যমে জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

১২) **আইন প্রণয়নে সাহায্য ঃ** আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দল সরকারি দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকে। বর্তমান সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ছাড়া আইন পাস সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বিরোধী দল সরকারি দলকে সমর্থন প্রদাননের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৩) **লোকবল নিয়োগ ঃ** অনেক সময় সরকারি পদে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী দল প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করে। প্রশাসন যন্ত্রকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিরোধী দল এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ সহজ হয়।

১৪) **সংসদীয় কাজে অংশগ্রহণ ঃ** বর্তমানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংসদীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। সাধারণত সংসদের কর্মসূচি বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

১৫) **বিকল্প সরকার ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলই বিকল্প সরকার। কেননা বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলে বিরোধী দলকেই দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়।

১৬) **সরকারকে আইনের গণ্ডি ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখে ঃ** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল আইনসভার ভিতরে প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, নিন্দা প্রস্তাব, মূলতবি প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আইন সভার বাইরে জনসভা, বক্তৃতা-বিবৃতি সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য করে। শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতির সচেতনতাই সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

১৭) **যোগ্য ও দরিদ্র প্রার্থীদের সাহায্য করা ঃ** বর্তমানে বিভিন্ন কারণে নির্বাচনী ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সামর্থ্যের অভাবে দরিদ্র এবং মেধাবী প্রার্থীগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এজন্য বিরোধী দলগুলোর উচিত যোগ্য ও দরিদ্র মেধাবী প্রার্থীদের মনোনীত করে নির্বাচনে জয়লাভ করনোর চেষ্টা করা।

১৮) **ভোটদানের উৎসাহ ঃ** জনমত গঠনের মাধ্যমে ভোটারদেরকে ভোটদানে উৎসাহিত করা বিরোধী দলের অন্যতম কাজ। অনেক সময় যোগ্য নাগরিকগণ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে বিরোধী দল তাদেরকে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত বা ভোটার বানানোর প্রচেষ্টা চালায়।

১৯) **শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তন ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল হচ্ছে বিকল্প সরকার। কেননা নির্বাচনে জয়লাভ করলে বিরোধী দল ক্ষমতা লাভের বা সরকার গঠনের সুযোগ পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক গণতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ, জাতীয় সমস্যার সমাধান এবং সর্বাপরি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

নির্বাচন কমিশন

BCS প্রশ্নাবলী

☑ **সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও উহার কার্যাবলী আলোচনা করিয়া উহাতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি?** (৩২তম বিসিএস)

☑ **জরুরি অবস্থা কি প্রেক্ষাপটে জারি করা যায়? জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত সংবিধানে বিধৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচনা করুন।** (৩০তম বিসিএস)

Scanned by CamScanner

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ সাংবিধানিক সংস্থা। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা ঃ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন [১১৮ (১)]। একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের সভাপতি হবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার [১১৮ (২)]। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনে অধিনে থেকে স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালন করবে [১১৮ (৪)]।

নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ ঃ নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসরকাল হবে [১১৮ (৩)]।

তবে ১১৮ (৩) (ক) অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির পর প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না এবং ১১৮ (৩) (খ) অনুযায়ী একজন নির্বাচন কমিশনার শুধুমাত্র প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন, অন্য কিছু না।

অপসারণ ঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না [১১৮ (৫)]। তবে কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন [১১৮ (৬)]।

উল্লেখ্য, ১১৮ (৫) অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের কর্মে শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানবলী এবং রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং কার্য্যাবলী নির্ধাতি হইবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১৯ অনুযায়ি নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী হলো–

১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী–

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে [১১৯ (১) (ক)] ঃ এই সংক্রান্তে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (১)]। তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তা পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (২)]।

সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে [১১৯ (১) (খ)] ঃ এই সংক্রান্তে বলা যায় যে, সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (৩)]। সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে-
১২৩ (৩) (ক) অনুযায়ী মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙ্গে যাবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং
১২৩ (৩) (খ) অনুযায়ী মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১২৩ (৪)। তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তা হলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে [১১৯ (১) (গ)] ঃ সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করতে পারবেন, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করবে [১১৯ (১) (ঘ)]।

উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করবে ১১৯ (২)।

উল্লেখ্য সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলে বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বন্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না [১২৫ (ক)]।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না [১২৫ (খ)]।

কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করে, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করবে না [১২৫ (গ)]।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে (১২৬)।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব ঃ নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যোগ্য, উপযুক্ত ও জনগণের পছন্দনীয় প্রার্থী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। নিম্নে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. **নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ :** বাংরাদেশ নির্বাচন কমিশন অবাধ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করেছে। সমগ্র দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ যাতে তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করতে পারে এ জন্যে এই বিভাজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার পরিমাণকে ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকা বিভাজন করে।

২. **নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা :** নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান করে। এতে করে প্রার্থী ও ভোটাররা নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে। নির্বাচনের নিয়ম-কানুন, ভোটদানের নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় 'নির্বাচনী তফসিলে' অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান :** স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদকরণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জালভোট প্রতিরোধে ভোটারদের জন্যে ছবিযুক্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করেছে।

৪. **নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ :** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'নির্বাচনী তফসিল' ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পর্যায়ে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। এ সময় প্রার্থীদের প্রচারণা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বিষয় সুশৃঙ্খল নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

৫. **কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান ও নির্বাচনী দায়িত্ব বন্টন :** নির্বাচন হলো একটি প্রক্রিয়া; সেখানে প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচার, ভোট দানের রীতি-নীতি থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। তাই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে নির্বাচন কমিশন তার অধীনে কর্মকর্তাদের নির্বাচনী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে রিটার্নিং ও পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬. **ব্যালট পেপার ও বাক্স সরবরাহ :** অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স সরবরাহ করে। বর্তমানে অবশ্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। ভোটদান প্রক্রিয়ায় আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ভোট সংগ্রহে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে ইভিম নিয়ে বির্তক রয়েছে।

৭. **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ :** নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। নির্বাচন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা, নির্বাচনী সহিংসতা রোধ ও নিরাপত্তার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে বিচার সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করতে হয়। প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল থেকে শুরু করে, জালভোট প্রদান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কর্তব্যরত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৮. **পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা প্রদান :** স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনে নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা প্রদান করেন। ফেমা (FEMA), ইইউ (EU) প্রভৃতি পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচন পরবর্তী প্রতিবেদন নির্বাচন স্বচ্ছতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা : বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের যে সকল দুর্বলতা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- দলীয় লেজুড়বৃত্তি, অপর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল, সেকেলে কারিগরি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিজ্ঞানের স্বল্পতা, অর্থনৈতিক সংকট, সমন্বয়হীনতা, প্রচার বিমুখতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। আর এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তার অভাব। এক্ষেত্রে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের আবশ্যকতা বর্তমানে জাতির জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশর মানুষ অপেক্ষা করছে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্য।

Student Works | সরকারী কর্ম কমিশন

কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে (১৩৭)।

নিয়োগ ঃ প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন [১৩৮ (১)]। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হবেন, যারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না [১৩৯ (৪)], তবে কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগলাভের যোগ্য থাকবেন এবং কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকবেন।

মেয়াদ ঃ এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসর বা তার পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন [১৩৯ (১)]।

অপসারণ ঃ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হবে না [১৩৯ (২)]। কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন [১৩৯ (৩)]।

দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেইরূপ হবে [১৩৮ (২)]।

খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা [১৪০ (১ক)]।

গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান [১৪০ (১খ)]।

ঘ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

ঙ) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে [১৪১ (১)]। রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকবে, যাতে কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ গৃহীত না হবার কারণ এবং যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সে সকল ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ না করার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করবে। যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন [১৪১ (৩)]।

রাষ্ট্রপতির সাথে কমিশনের পরামর্শ ঃ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সাথে অসামঞ্জস্য নয়) বিধানবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন [১৪০ (২)] ঃ

ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি ;

খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ ;

গ) অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি এবং

ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার

BCS প্রশ্নাবলী

- ☑ স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রকরণ সম্ভব নয়-বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন। (৩২তম বিসিএস)
- ☑ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বর্ণনা দিন। (২৯তম বিসিএস)
- ☑ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (২৯তম বিসিএস)
- ☑ স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিন। (২৭তম বিসিএস)
- ☑ উপজেলা পদ্ধতির ভালো-মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করুন। উপজেলা পদ্ধতির স্থানীয় সরকার পুনরায় চালু করা উচিত কিনা- যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন। (২৪ তম বিসিএস)
- ☑ স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? (১৮তম বিসিএস)

Teacher's Discussion — বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ। এখানে রয়েছে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ-জাতীয় সংসদ। এটি সরাসরি কেন্দ্র শাসিত একটি দেশ। এখানে কেন্দ্রিয় সরকারই সার্বভৌম সরকার বাংলাদেশ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মন্ত্রিপরিষদ শাসিত একটি দেশ, যার কেন্দ্রে রয়েছেন একজন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি এখানে নামে মাত্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পুরো মন্ত্রীপরিষদ যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ।

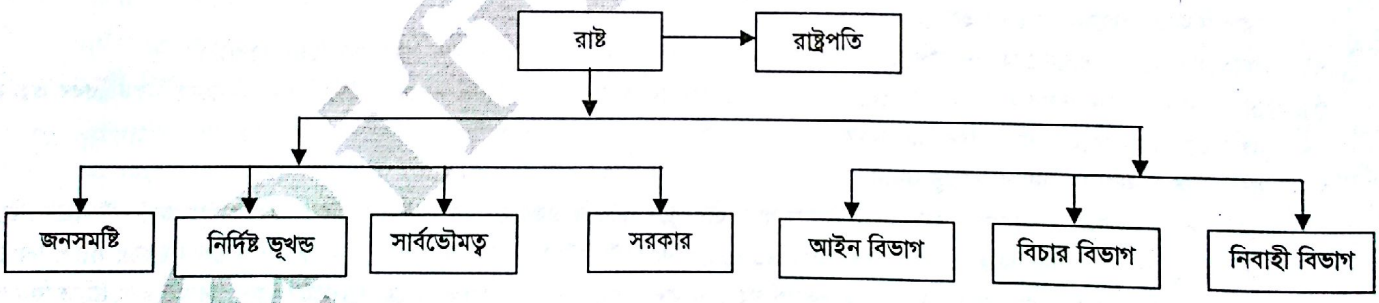

রাষ্ট্রের প্রধান চারটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদানের একটি সরকার। সরকারের প্রধান কাজ জননীতি প্রনয়ন ও তার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাষ্ট্র পরিচালনা নিমিত্তে সরকারের প্রয়োজনীয় বাহনগুলো হলো নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের আইন বিভাগের কাজ আইন প্রনয়ন করা, বিচার বিভাগের কাজ বিদ্যমান আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান এবং সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নির্বাহী তথা শাসন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন বিভাগের প্রনীত আইনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। নিম্নে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হলো-

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামো

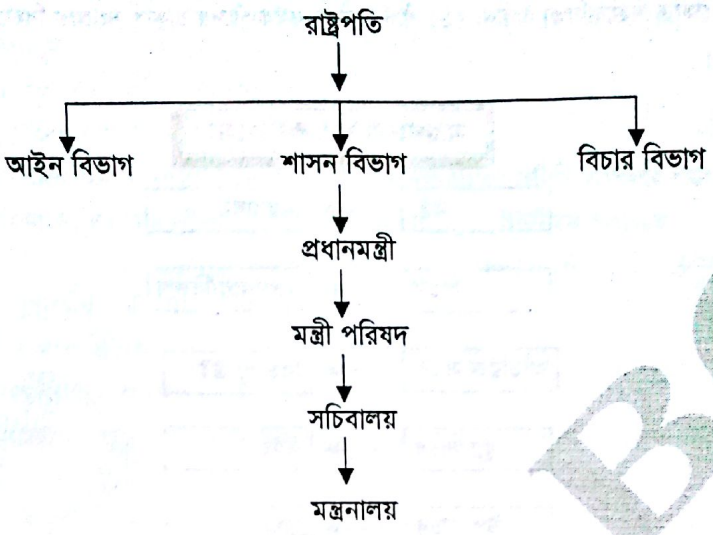

মন্ত্রিপরিষদ ঃ রাষ্ট্রীয় নীতিভিত্তিক প্রশাসন পরিচালনায় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য নিয়োজিত শীর্ষ মন্ত্রীদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের কার্যপ্রণালী বিধিমালার ৪ (খ) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন ব্যতীত নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হতে পারে না। বিশেষত, সরকারী নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব বিষয় মন্ত্রিপরিসদ কর্তৃক নিষ্পন্ন হতে হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

ক) অধ্যাদেশ জারিসহ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

খ) গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ;

গ) কোন বিদ্যমান নীতি অথবা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ। নির্বাচিত নীতিসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রিপরিষদ কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদের নিজস্ব কমিটি রয়েছে। এজাতীয় কমিটির মধ্যে আছে ঃ

(১) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি; (২) প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ক কমিটি;
(৩) জাতীয় পুরস্কার প্রদান কমিটি; (৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি;
(৫) বেতনকাঠামো নির্ধারণ কমিটি; (৬) বিদেশে নিয়োগদান সংক্রান্ত কমিটি;
(৭) জরুরী ও জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত কমিটি; (৮) অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি;
(৯) বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি; এবং (১০) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি।

সচিবালয় ঃ সচিবালয় সকল প্রকার উপাত্ত, সংবাদ ও তথ্যের সরবরাহ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকে আর এরই ভিত্তিতে মন্ত্রী নীতি নির্ধারন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণায়লয়ের সচিবালয় সংগঠনের সমষ্টিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয় (Secretariat) প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে সচিবালয়। সচিবালয় যেন সরকারি কার্যক্রম ও প্রশাসনিক দেহের স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre)। সচিবালয়েই সকল প্রকার প্রশাসনিক নীতি প্রণীত হয় আর প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য এখান থেকেই নির্বাহী সংগঠনে প্রেরিত হয়। নীতি একবার প্রণীত হলে সচিব বিভিন্ন নির্বাহী বিভাগীয় প্রধানদের (Heads of departments) নিকট বাস্তবায়নের জন্য প্রেরন করেন আর বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় তত্ত্বাবধান করেন। মূলত সচিবালয়ের কাজ হচ্ছে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন পরিষদে মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা দান ও কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা।

মন্ত্রণালয় ঃ স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট পরিমন্ডলে সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হচ্ছে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত। জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্বভারও মন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত। সচিবপদে অধিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় একজন আমলা মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক প্রধান। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন এবং যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনিই দায়ী থাকেন। তিনি মন্ত্রণালয় সংযুক্ত অধিদপ্তর ও অধীনস্থ অফিসসমূহের মুখ্য অর্থ কর্মকর্তাও।

Scanned by CamScanner

তিনি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত রাখেন। ১৯৯৬ সালের কার্যপ্রণালী বিধিমালার ৪ (ঝ) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্বসমূহ হচ্ছেঃ (১) নীতি প্রণয়ন; (২) পরিকল্পনা প্রণয়ন; (৩) পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন; (৪) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ; (৫) মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে সংসদে তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান; (৬) শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এবং (৭) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন।

মন্ত্রণালয়ের কাঠামো

মন্ত্রী	→	মন্ত্রণালয়
সচিব	→	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব	→	বিভাগ/ উইং
যুগ্ম সচিব	→	উইং
উপ সচিব	→	ব্রাঞ্চ
সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব	→	সেকশন

বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার কাঠামো

স্থানীয় সরকারঃ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন কর্ম পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, এলাকা ভিত্তিক এরূপ শাসনই স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন। জাতিসংঘের মতে "Local self government is a political sub- division of a state or a nation which is constituted by law and has substantial control over local affairs including the power to impose taxes or extract labor for prescribed purposes".

অধ্যাপক R.M. Jackson বলেছেন, 'Local government is essentially a method of getting various services run for the benefit of the community. It is a practical business, and if we think of it in this way, we are more likely to see its real nature than if we think in terms of training for citizenship.'

স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন

প্রাচীন ও মধ্যযুগ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোনরূপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় নি। তবে কোন কোন গবেষক 'পঞ্চায়েত' নামে একটি স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক যুগ ঃ আধুনিক যুগে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আধুনিক যুগকে আমরা বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

ক) **বৃটিশ আমল ঃ** বৃটিশরাই ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ জামিনদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। স্থানীয় সরকার বিষয়ে বৃটিশদের প্রধান তিনটি উদ্দ্যোগ ছিল ঃ-

1) The village Chowkidary Ponchayet Act: 1870
2) The Bengal local self Govt. Act-1885
3) The Bengal Village Self Govt Act-1919

বৃটিশদের সময়ে স্থানীয় সরকার ছিল ৩ স্তর বিশিষ্ট- ১) ইউনিয়ন কমিটি, ২) লোকাল বোর্ড ও ৩) জেলা বোর্ড।

Scanned by CamScanner

খ) **পাকিস্তান আমল ঃ** ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গনতন্ত্র (Basic Democracies) আইন প্রবর্তন করেন। এটির বৈশিষ্ট্য ছিল উপরের দিক থেকে এটি একটি কর্তৃত্ব বাদী সরকার কিন্তু স্থানীয় স্তরে যোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার। মৌলিক গণতন্ত্র আইনে ৪ স্তরের স্থানীয় সরকার ছিল।
১) ইউনিয়ন কাউন্সিল; ২) থানা কাউন্সিল; ৩) জেলা কাউন্সিল; ৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

গ) **বাংলাদেশ আমল (গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ) ঃ**

- ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশ দ্বারা মৌলিক গনতন্ত্র আইন বাতিল।
- ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২২নং আদেশ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ গঠন।
- ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের সরকারের উদ্দ্যোগ নিয়েছিল ৬৫ হাজার গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনকরে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন পরিষদ তুলে দেওয়া।
- শেখ মুজিবের সময়ে স্থানীয় সরকারের স্তর ছিল ২টি ঃ- ১) ইউনিয়ন কাউন্সিল ..... ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ..... ইউনিয়ন পরিষদ
  ২) জেলা কাউন্সিল ..... জেলা বোর্ড ..... জেলা পরিষদ
- ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে ১ম বারের মত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়।
- জিয়ার আমলে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ নামে স্থানীয় সরকার ছিল।
- ১৯৮০ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন। পরবর্তীতে এটি বাতিল হয়।
- ২০০৮ সালে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭এর কমিশনের সুপরিশের ভিত্তিতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থায়ী "স্থানীয় সরকার কমিশন" গঠন করেন।
- ২০শে এপ্রিল ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন আইন) অনুমোদন করা হয়। এবং এর নির্বাচনের ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন কমিশনে হস্তান্তর করাহয়।

বাংলাদেশের Local Govt. এর সংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্যে স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত বিধানসমূহ অন্যতম। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে'। স্থানীয় শাসন ভাগের ৫৯ ও ৬০ ধারায় স্থানীয় শাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে। ৫৯ (১) বিধিতে বলা আছে, 'আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে'। ৬০ নং অনুচ্ছেদে ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে। অনু ঃ ১৫২ এ জেলাকে স্থানীয় সরকারের একক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের আইনগত ভিত্তি ঃ পৌরসভা আইন-১৯৭৭, ইউনিয়ন পরিষদ আইন-১৯৭৩, উপজেলা বাতিল আইন-১৯৯২, উপজেলা পূনঃপ্রবর্তন আইন-১৯৯৮, গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ এবং ২০০৮ সালের উপজেলা পরিষদ (সংশোধন আইন)।

স্থানীয় সরকার বনাম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার

স্থানীয় সরকারকে স্বায়িত্ব শাসিত স্থানীয় সরকার হতে হলে নিম্ন লিখিত ৪টি শর্ত পূরণ করতে হয়।
১) নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতা, ২) নির্বাচন, ৩) করারোপের ক্ষমতা ও ৪) বাজেট প্রনয়ন ও তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা।
যদিও স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়িত্ব শাসিত সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সংবিধানের নিরিখে এটিকে স্থানীয় স্বায়িত্ব শাসিত সরকার বুঝে থাকি।

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন।
২) এটি হলো স্থানীয় জনগন দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জন্য গঠিত সংস্থা।
৩) কর ধার্য করণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিজস্ব কার্যাবলী ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে।
৪) এই সরকার প্রকৃত ভাবে কেন্দ্রীর সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

Scanned by CamScanner

স্থানীয় সরকারের ধরন

বাংলাদেশে ২ ধরনের স্থানীয় সরকার আছে- ১) গ্রামীন অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ও ২) শহর/নগর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার। ২০০৮ সালের মে মাসে, জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তিন স্তর বিশিষ্ট এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান স্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

ইউনিয়ন পরিষদ

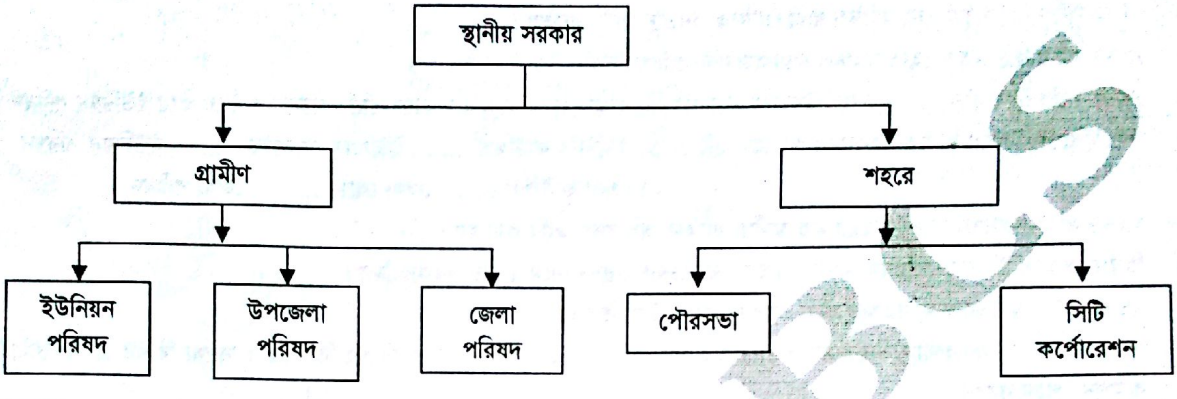

১৯৯৩ সালে গৃহীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন আইন অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়নের সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্য কথায়, ইউনিয়ন পরিষদের গঠিত হবে ১২ জন সদস্য এবং একজন চেয়ারম্যান সমন্বয়ে। ১৯৯৭ সালের আইন অনুযায়ী ৩ জন মহিলা সদস্য বিশেষভাবে সংগঠিত নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ফলে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের মনোনয়ন ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

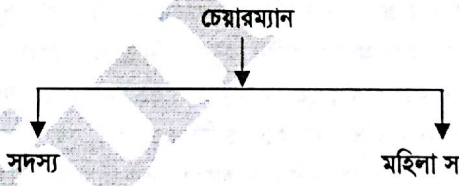

কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। এসকল কার্যাবলীকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক- মৌলিক কার্যাবলী এবং খ- উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

ক) মৌলিক কার্যাবলী ঃ প্রধান প্রধান মৌলিক কার্যাবলীগুলো হলো ঃ

১) শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা;
২) গ্রাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৩) রাজস্ব আদায় করা;
৪) ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার করা;
৫) দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
৬) সরকারের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

খ) উন্নয়নমূলক কাজ ঃ উন্নয়নমূলক কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও তত্ত্বাবধান করা এবং আলোর ব্যবস্থা করা;
২) রাস্তাঘাটের পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা;
৩) খেলাধুলার জন্য মাঠ নির্মাণ, পার্ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করা;
৪) কবরস্থান, শ্মশান, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি সাধারণ স্থান সংরক্ষণ করা;
৫) এতিমখানা স্থাপন;
৬) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান করা;
৭) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা;
৮) নলকূপ স্থাপন করা ও ড্রেনের ব্যবস্থা করা;
৯) জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে রেজিস্ট্রি করা;
১০) পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা;
১১) স্থানীয় শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করা এবং
১২) সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

Scanned by CamScanner

উপজেলা পরিষদ

১৯৯৮ সালে প্রনীত আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে, উপজেলার জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সকল পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মহিলা সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের সমন্বয়ে। মহিলা সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হবেন এই পরিষদের সচিব। ঐ এলাকার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য হবেন উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা। পরিষদের কার্যকাল তার প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর। ২০০৮ সালে সংশোধিত উপজেলা পরিষদ আইনে উপজেলা পরিষদে একজন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান অর্থাৎ দুই জন ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

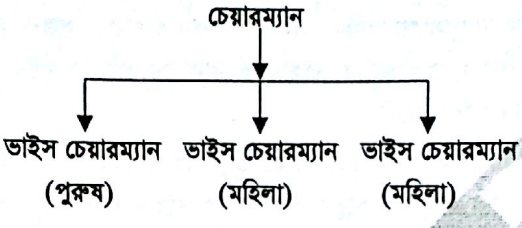

কার্যাবলী ঃ উপজেলা পরিষদের প্রধান প্রধান কার্যাবলীগুলো হলো ঃ

১) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
২) ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করা;
৩) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৪) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫) সমবায় আন্দোলন জোরদার করা;
৬) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ কার;
৭) শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা;
৮) পশুপালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ করা;
৯) নারী ও শিশু নির্যাতন বা পাচার রোধ করা;
১০) পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় আইনশৃঙ্খলা নিশ্চয়তা বিধান করা ইত্যাদি।

উপজেলা ব্যবস্থা বিতর্ক

উপজেলা ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রীকরণ ঃ আশির দশকের শুরুতে ক্ষমতা গ্রহণের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের প্রশাসনিক সংস্কার ও সুবিন্যস্তকরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার গৃহীত এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন। তিনি ১৯৮২ সালে প্রথম উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৪৫টি মান উন্নীত থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে দেশের সব কটি থানাকেই উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। এ সময় ফৌজদারি কোর্টকে জেলা থেকে উপজেলায় স্থানান্তর এবং সকল বিভাগে উপজেলা অফিস স্থাপন করা হয়। ফলে দেশের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় উপজেলা। প্রতি উপজেলায় একজন চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার অধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে উপজেলা পরিষদের সদস্য হন। তবে বিকেন্দ্রীকরণের একটি পদক্ষেপ হিসেবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে এক পর্যায়ে দেশের সর্বত্র এ ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে।

১) **ইতিবাচক দিকসমূহ ঃ** ১৯৯১ সালের যখন উপজেলা ব্যবস্থা রহিত করা হয় তখন অনেকেই এ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তখন তারা যে সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন সেগুলো হলো ঃ

ক) **গ্রামীণ এলাকার প্রতি বিশেষ নজর দান ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হয় তখন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে বিশেষ নজর দান। সেজন্য বেশ কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন- কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স স্থাপন, WFP, FFWP প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড।

Scanned by CamScanner

খ) **দ্রুত ও সহজ বিচারব্যবস্থা ঃ** বিচারব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল উপজেলা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারি কোর্ট স্থাপন করা হয়, যাতে সহজেই গ্রামীণ জনগণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

গ) **পল্লী উন্নয়নের গণতান্ত্রিক রূপায়ণ ঃ** উপজেলা ব্যবস্থায় পল্লী উন্নয়নের বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উন্নয়ননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এ ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নীতিকে বাস্তবায়নের নানা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

ঘ) **পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কেননা তখন উপজেলা ছিল সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে জেলার সাথে উপজেলার যোগাযোগ, আন্তঃউপজেলা কেন্দ্রবিন্দু এবং উপজেলার সাথে প্রতিটি ইউনিয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

ঙ) **গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেকগুলো নতুন বিভাগ উপজেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হয়। যেমন- উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, মৎস্য অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, সমবায় অফিস প্রভৃতি। সেজন্য সৃষ্টি করতে হয় নানা সুযোগ-সুবিধা। অফিস ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, রাস্তাঘাটের সংস্কারসহ নানা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এভাবে একসময়ের অবহেলিত থানা প্রশাসনের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।

চ) **রাজনৈতিক উন্নয়ন ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভাবটি গ্রামীণ এলাকায় পড়েছিল, সেটি হলো জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন গ্রামীণ নেতৃত্বের পাঠশালা হিসেবে কার্যকর ছিল। ফলে এটি গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

ছ) **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পল্লী এলাকায় কর্মচাঞ্চল্য এসেছিল এবং জনগণের একটি অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এতে দেশের সবকটি উপজেলায় প্রায় একই সঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল।

২) **নেতিবাচক দিকসমূহ ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবতা ছিল তার থেকে অনেক দূর। যেমন–

ক) **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ঃ** সরকারি সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করাই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ সরকারি বণ্টন ব্যবস্থাকে রাজনীতিকীকরণের ফলে উপজেলা পরিণত হয়েছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট আর অব্যবস্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যানগণ তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতেন। যথা- বিভিন্ন টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান, হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ঘাট প্রভৃতি নিজেদের লোকদের ইজারা প্রদান; বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান প্রভৃতি।

খ) **উপদলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব ঃ** বিকেন্দ্রীকৃত উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে বিভিন্ন দল-উপদল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ সকল দ্বন্দ্ব হলো সাধারণত উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাংসদদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজেদের মধ্যে।

গ) **জনগণের অংশগ্রহণের অসারতা ঃ** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবতা ছিল উল্টো। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

ঘ) **স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ঃ** বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু উপজেলা ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তার এতে ব্যর্থ হয়। তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারেনি।

ঙ) **নির্বাচনী গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঃ** ১৯৮৫-১৯৯০ সালের মধ্যে দেশে দুটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের চেয়ে সন্ত্রাস, কারচুপি, ব্যালেট বাক্স চুরি প্রভৃতিরই প্রাধান্য ছিল এবং নির্বাচন উপহাসে পরিণত হয়েছিল। সর্বশেষ উপজেলা নির্বাচন ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও সরকারি দলের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চ) **গ্রামীণ টাউটদের উৎপত্তি ঃ** বিকেন্দ্রীকরণের নামে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি অফিস-আদালতে জনগণের প্রবেশের পথ মোটেও সুগম হয়নি। বরং একে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় এক শ্রেণীর টাউটের উৎপত্তি হয়, যারা জনগণের হয়ে এসব অফিস-আদালতে ধর্না দিত এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করতো।

ছ) **মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণতি ঃ** বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদ্দেশ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থা তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন জনগণের অতি সাধারণ বিষয়েও মামলা-মোকদ্দমা করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীরা অহেতুক তাদের বিরোধীদের হয়রানির জন্য এ সুযোগ কাজে লাগায়।

Scanned by CamScanner

জ) **সমন্বয়ের অভাব ঃ** উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করে।

ঝ) **অমনোযোগী নেতৃত্ব ঃ** উপজেলা পরিষদের নেতারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিও তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই রাজধানী কিংবা জেলা শহরগুলোতে অবস্থান করতেন। ফলে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজখবর কমই রাখতে পারতেন।

ঞ) **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের আঞ্চলিকতা ঃ** উপজেলা উন্নয়ন কমিটির মিটিংয়ের সময় চেয়ারম্যানরা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। এতে সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্য দেখা দিয়েছেল।

দেশের প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের সাথে সরকারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উপজেলা ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরশাদ সরকারের আমলে প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার বাতিল করে এবং ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি আইন পাশের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে আইন পাস করে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার সকল প্রশাসনিক থানাকে উপজেলা হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্রপতি উপজেলা পরিষদে ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন মহিলা) সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের আলোকেই অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালের তৃতীয় ও পরবর্তী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনসমূহ।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে। জেলা পরিষদে থাকবেন তিন প্রকার সদস্য ঃ জেলার নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য, মনোনীত মহিলা সদস্য ও সরকারি সদস্য। প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সমান নয়। মনোনীত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মনোনীত মহিলা সদস্য ও সরকারি সদস্যের মোট সংখ্যার চেয়ে কম হবে না। জেলা পরিষদের সরকারি সদস্যরা পদাধিকার বলে সদস্য হবেন। এ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে কোন কোন বিভাগের কর্মকর্তারা সদস্য হবেন। মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দান করবেন বিভাগীয় কমিশনার। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন জেলা পরিষদের নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের মধ্য হতে। জেলার পল্লীউন্নয়ন বিষয়ক সহকারী পরিচালক জেলা পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবেন। বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় একজন করে প্রশাসক নিয়োগ প্রদান করেছেন।

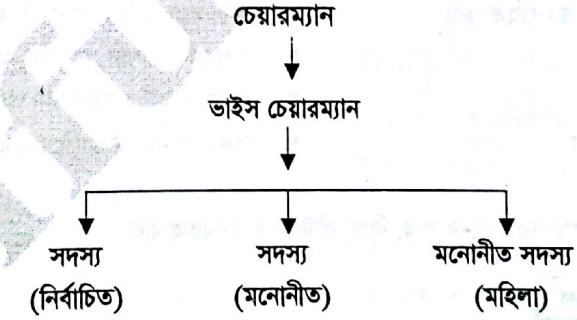

কার্যাবলী ঃ জেলা পরিষদের প্রধান প্রধান কার্যাবলীগুলো হলো ঃ

ক) উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এরূপ রাস্তাঘাট, সেতু, পুল, জলপথ নির্মাণ ও মেরামত করা;
খ) প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা;
গ) লাইব্রেরি, হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করা;
ঘ) বৃক্ষরোপণ, পার্ক, মসজিদ, মন্দির, ডাক বাংলো ও রেস্ট হাউস নির্মাণ করা;
ঙ) মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা;
চ) আদর্শ কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করা, উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা করা;
ছ) এতিমখানা, আশ্রম স্থাপন করা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করা;
জ) গণপূর্ত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যবলী সম্পাদন করা;
ঝ) সরকারি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।

Scanned by CamScanner

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকার ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ। আর শহরের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা। দুই বন্দর নগরীর জন্য রয়েছে দুটি পোর্ট ট্রাস্ট এবং ৬ টি সেনানিবাসের জন্য রয়েছে ৬ টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা বিভাগে মোট ১১ টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে ।

গঠন ঃ পৌরসভা গঠিত হয় একজন মেয়র, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচিত কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরের সমন্বয়ে। মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনের নারী কাউন্সিলরগণও ৫ বছরের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশনেও একজন মেয়র প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন কমিশনার এবং ৩টি ওয়ার্ড মিলে একজন নারী কমিশনার নিয়ে গঠিত।

কার্যাবলী ঃ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করা;
খ) বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের ব্যবস্থা করা, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা ও মেরামত করা;
গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা;
ঙ) রাজপথ ও সড়ক নির্মাণ করা;
ছ) পার্ক, উদ্যান তৈরি ও সংরক্ষণ করা;
ঘ) পৌর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর পরিচালনা করা;
চ) জননিরাপত্তা বিধান করা;
জ) সুশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা, স্থানীয় সরকার গুলোর প্রতিটি স্তরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এসব কার্যাবলীর অধিকাংশই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন ঃ

- শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- রাজস্ব আদায় করা
- সরকারের কাজে সহযোগীতা করা
- রাস্তাঘাটের পাশে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষন করা
- পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে জনসাধারনকে উৎসাহিত করা
- স্থানীয় শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করা
- সমবায় আন্দোলন জোরদার করা
- নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার রোধ করা
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
- গ্রাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- দূর্যোগকালীন সময়ে ত্রান ও পূর্নবাসনমূলক কাজে অংশগ্রহন করা
- রাস্তাঘাট নির্মাণ মেরামত ও তত্ত্বাবধান করা
- খেলাধুলার জন্য মাঠ নির্মাণ পার্ক নির্মাণ মেরামত ও সংরক্ষন করা
- জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে রেজিষ্ট্রি করা
- কবরস্থান, শ্মশান, মসজিদ, মন্দির প্রকৃতিস্থান সংরক্ষন করা
- পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় আইনশৃঙ্খলা নিশ্চয়তা বিধান করা
- বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ করা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যা গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- **অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ঃ** স্থানীয় সরকারের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আমাদের দেশে বাজেট প্রণীত হয় উপরিমহল থেকে এবং তা নিম্নপর্যায়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের কিছু করণীয় থাকে না। তাই সাংবিধানিক ভাবে স্থানীয় সরকারের অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং আদায়ের ব্যবস্থাসহ নিজস্ব বাজেট প্রণয়নের একটি অংশ স্থানীয় সরকারকে দেওয়া যেতে পারে। এ লক্ষে সাংবিধানিক ভাবে একটি স্থানীয় অর্থ কমিশন গঠন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য ভারতে এ ধরনের কমিশন রয়েছে।
- **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান ঃ** স্থানীয় সরকারের নেয়া প্রতিটি পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান দিতে হবে।
- **অধীনস্ত কর্মকর্তাদের উপর কর্তৃত্ব ঃ** স্থানীয় সরকারকে অধীনস্ত কর্মচারী পরিচালনার অধিকার দিতে হবে। তবেই স্থানীয় সরকারের কাঠামো আরো সুদৃঢ় হয়ে কার্যবলী সম্পাদনে আরো গতিশীলতা পাবে।

Scanned by CamScanner

- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ** স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাবে যেকোন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **আমলাতন্ত্রের হাতিয়ার না করা ঃ** স্থানীয় সরকারকে কিছুতেই আমলাতন্ত্রের হাতিয়ার করা যাবে না। এজন্য স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক ভাবে কার্যকরী স্বীকৃতি দিতে হবে।

স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ- একটি অত্যাবশ্যক করণীয়

সুষ্ঠু প্রশাসনিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতার অবস্থান এবং হস্তান্তর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। প্রশাসনিক ক্ষমতা এককেন্দ্রিক বা বিকেন্দ্রিক হতে পারে। যেখানে প্রশাসনিক সংস্থার সব কাজ এবং দায়িত্ব কেন্দ্রে বা কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়োজিত থাকে সেখানে কেন্দ্রীকরণ হয়েছে বলা চলে। পক্ষান্তরে, যেখানে প্রশাসনিক সংস্থার কাজ ও দায়িত্ব কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না থেকে বিভিন্ন অধস্তন সংস্থাসমূহে বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা চলে। এভাবে কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্তকরণকেই স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। Dwight Waldo-এর মতে, 'Decentralisation denotes a tendency where administration and responsibility are delegated from the central authority to regional and local units to suit the particular local condition.' এর ফলে প্রশাসনিক সংস্থার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও কাজ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষমতা ও দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। এর ফলে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী ও ক্ষমতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে এর প্রতিচ্ছবি রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারই সকল প্রকার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে, তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের সফলতার অনেকাংশ স্থানীয় সরকারের কার্যাবলীর ওপর নির্ভরশীল। কারণ জনগণ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাই স্থানীয় সরকার যতটা সফলভাবে , দক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সফলতাও এর মাধ্যমে নিরূপিত হবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীয়করণের উপাদানসমূহঃ সমস্ত বিশ্বের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের একাধিক উপাদান রয়েছে, সেই আলোকেই বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণের উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১) **দায়িত্বশীলতার উপাদান ঃ** দায়িত্বশীলতার উপাদানটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের পথকে অনেকটা দুর্গম করে দেয়। স্থানীয় পর্যায়ে যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তার জন্য স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ ও সকল দায়িত্ব স্থানীয় সরকারই সম্পন্ন করে, সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ওপর কর্তৃত্ব রেখে দেয়, কেননা তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেতে পারে ।

২) **প্রশাসনিক উপাদান ঃ** যেসব প্রশাসনিক উপাদান বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীয়করণকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো- age of the agency, stability of the policies and method of the agency, competence of the agency's field personnel, speed and economy of the agency, administrative sophistication বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩) **কাজ সম্বন্ধীয় উপাদান ঃ** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় উপাদান এটি। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয় তা হলো- পরিচালনার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন কতটুকু, এ কাজ বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে জাতীয় ঐক্য নাকি অনৈক্য আনবে ইত্যাদি ।

৪) **বাহ্যিক উপাদানসমূহ ঃ** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের বাহ্যিক উপাদান যেমন-নাগরিকদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অধীন করা, অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপন ও আঞ্চলিক কার্যাবলিকে রাজনৈতিক চাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করে তোলার বিষয়গুলো ও বিরাজমান।

৫) **বাংলাদের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাবলী:** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণেরও কিছু সমস্যা বিরাজমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৬) **ঐতিহ্যগত প্রভাব ঃ** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সর্বপ্রথম বাধা হলো ঐতিহ্যগত প্রভাব। কেননা বিশ্বের চলমান গতির কারণে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। তাই স্থানীয় প্রশাসনের সফলতার জন্য পুরোনো ধ্যানধারণা বা রীতিনীতি পরিহার করে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ।

৭) **কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ঃ** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সঠিকভাবে করতে হবে। শুধু নামমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করা হয় না ।

Scanned by CamScanner

৮) **স্থানীয় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব ঃ** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের পথে এটি একটি বড় বাধা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক মদদপুষ্ট গোষ্ঠীসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রয়োগ করতে পারে না বিধায় স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণে পথে এটি অনেক বড় একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে ।

৯) **বিভিন্ন বিকেন্দ্রিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঃ** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাবলীর মধ্যে এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। কেননা একটি কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদন কোনো একক সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয় না। তাই অনেকগুলো বিকেন্দ্রিক সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে এ সমন্বয় সুষ্ঠু হয় না বিধায় স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণও সত্যিকারার্থে সম্ভব হয়নি।

সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ১৯৭০-১৯৮০ দশক-পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে পৃথিবীব্যাপী যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের খুব বেশি আধুনিকায়ন হয়নি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। তাই রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং ক্ষমতার স্বচ্ছ বণ্টন প্রদানপূর্বক কেন্দ্রীয় বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করলে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার

BCS প্রশ্নাবলী

☑ বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কত দূর? এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আপনার সুপারিশ আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]

Student Work বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার

প্রশাসনিক সংস্কার

বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণকামী রাষ্ট্র বিধায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে প্রশাসনিক কাজের পরিধির ব্যাপকতার ফলে প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে পরিবর্তন। সামাজিক প্রয়োজন তথা রাষ্ট্রীয় চাহিদা এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখেই প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। এর এটাই হচ্ছে প্রশাসনিক সংস্কার। Jon Quals মতে প্রশাসনিক সংস্কার হলো 'deliberate attempt to change both (a) the structure and procedures of public bureaucracy; and (b) attitudes and behaviour of public bureaucrats involed to promote organizational effectiveness and attain national goals'.

প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা

১) সমাজের সততা পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তবে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ এবং চাহিদাসমূহ মোকাবিলার জন্য এ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি জনসাধারণের চাহিদা ও আকাঙ্খার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২) আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অনেকে অকর্মণ্য সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আবার অনেকে পদ্ধতিগত অনমনীয়তা (Systematic rigidities) হিসেবে বিবেচেনা করেন। আমাদের দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কার্যাবলী সাধারণত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু প্রচলিত আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনেক বেশি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আইনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে বা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি এবং সমাজের প্রতি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আইনি কর্তব্য সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় সমাজ ও নাগরিকদের প্রতি আইনি কর্তৃত্ব।

Scanned by CamScanner

৩) বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্নীতি ব্রিটিশ আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রায় সকল স্তরের কর্মকর্তার মধ্যে তা সংক্রামক ব্যাধির মতো বিরাজ করছে। আজ দেশের জনগণকে প্রশাসনিক দুর্নীতির শিকার হচ্ছে প্রতি পদে, নানাভাবে-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। এ অন্যায়, অবিচার আর দুর্নীতি থেকে জনগণকে মুক্তি করতে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

৪) বাংলাদেশের সরকার অনেকাংশেই আমলানির্ভর আর আমলানির্ভর সরকার হলো আমলাতন্ত্রের নামান্তর। গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য আমলাতন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। এজন্য গণতন্ত্র হয় বাধাগ্রস্ত। দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কর্তৃক আমলাদের কাছে অন্যায় ও বেআইনি আবদারই আমলাদের দুর্নীতিবাজ করার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৫) বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাধারণত মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা ও বিবৃতি দানে পটু। দেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে তারা তেমন একটা ওয়াকিবহাল নন। অন্যদিকে আমলাতন্ত্র দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কাজের জন্য দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে। তাই আমলাতন্ত্র চায় না রাজনৈতিক সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করুক। অন্যদিকে রাজনৈতিক সরকার ও আমলাদের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। ফলে বর্তমান বিদ্যমান প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি হয়, যে কারণে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাছাড়া বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিত একটি সমস্যা এবং সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহার সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থকে পর্যদুস্ত করছে। এমতাবস্থায় দেশ ও দশের স্বার্থে প্রশাসনিক সংস্কার একান্ত আবশ্যক।

সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ২১টি কমিশন প্রশাসনিক সংস্কাররের জন্য গঠিত হয়েছে। এসব কমিটি সংস্কারের উদ্দেশ্য নানাবিধ সুপারিশমালা পেশ করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কোনো সুপারিশই পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত আমলাতন্ত (Bureaucracy) এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি (Political system) থেকেই অধিকাংশ সংস্কার প্রচেষ্টা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। সংস্কারের প্রয়োজীনয়তা সম্পর্কে দৃঢ় সিদ্ধান্তের অভাব, পরিবর্তনের ব্যাপারে অনীহা এবং বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত (Maintaining Status-quo) রাখার প্রবণতার কারণেই মূলত সংস্কার কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহই প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

- ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ (Centralization of Authority)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুবিধ স্তর (Multiple Layers of decision making)
- নিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালী বিধি (Regulatory modus operandi)
- নিয়মানুগ অবিশ্বাস (Systematic Lack of trust)
- জবাবদিহিতার অভাব (Lack of Accountability)
- প্রতিশ্রুতির অভাব (Lack of Commitment)
- উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থার অভাব (Lack of incentive)
- শ্রেণীবিভাগের ওপর অধিক নির্ভরতা (Execessive reliance of hierarchy)
- বিস্তারিত গতানুগতিক বিধি-বিধান (Elaborate formal rules and regulations)
- অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ (Execessive Controls)
- অধীনস্তদের ওপর বিশ্বাসের অভাব (Lack of trust in the subordinates)
- পুনঃপুনঃ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা বিভাজন (Diffusion of accountability through overlapping checks and balances)
- স্বচ্ছলতার অভাব (Lack of transperancy)

প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা বিবেচনায় আনা যেতে পারে -

০১) **সরকারি ক্ষেত্রসমূহের সীমা নির্ধারণ ঃ** স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের সরকারের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৯টি, যেখানে মালয়েশিয়ায় ২৪টি এবং কোরিয়ায় ২৫টি। প্রায় ১০ লাখের মতো সরকারি কর্মচারি আছে। সরকারের আয়তন বাড়লেও গুনগত মান আদৌ বাড়েনি। এজন্যই সরকারের ভূমিকা পুনঃনির্ধারণ প্রয়োজন। এজন্য নিম্নবর্ণিত চারটি পদক্ষেপ নিতে হবে-

ক) সরকারের আয়তন ছোট এবং যথার্থ করা।
খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
গ) স্থানীয় সরকারসমূহের প্রতিপালন।
ঘ) ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃদ্ধিকরণ।

Scanned by CamScanner

০২) জবাবদিহিতা এবং প্রতিবেদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (Enhancing Accountability and Responsiveness of the Govt.) ঃ বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি পর্যন্ত কোথাও জবাবদিহিতার লেশমাত্র নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) Individual Responsibility থাকতে হবে।
খ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কর্মসম্পাদনের কর্তৃত্ব দিতে হবে।
গ) Monitoring এবং Supervision-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ঘ) গণমাধ্যমের Accessibility থাকতে হবে।
ঙ) নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
চ) ন্যায়পালের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
ছ) সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
জ) Customer Service Standards প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
ঝ) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।
ঞ) দুর্নীতি দূর করতে হবে।

০৩) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি (Transperancy) ঃ প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নে যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি তা হলো-

ক) Job description নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
খ) কাজের গতিপ্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে।
গ) বর্তমান প্রচলিত 'Secret Act' বাতিল করতে হবে।
ঘ) অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সব বিষয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

০৪) দক্ষতা বৃদ্ধি (Enhancing efficiency) ঃ প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক-

ক) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
খ) প্রশাসনে উপযুক্ত ও দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে।
গ) নিয়োগ পদ্ধতি আধুনিক করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ঘ) শিক্ষানবিশকালকে গুরুত্বের সাথে বিচার করতে হবে।
ঙ) Motivation এবং Inventives প্রদানের ব্যবস্থা করতে করে।
চ) Automation এবং Information Network System (INS) প্রবর্তন করতে হবে।
ছ) বিভিন্ন সার্ভিসের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।

০৫) গতিশীলতা ও কার্যকারিতা (Dynamism & effectiveness) ঃ স্থবির হয়ে পড়া বাংলাদেশের প্রশাসনে গতিসঞ্চার এবং কার্যকর করতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) প্রতিটি কর্মসম্পাদনে একক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।
খ) দ্রুত এবং যথাযথ Logistic Support প্রদান করতে হবে।
গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটি পর্যায় ধার্য করতে হবে।
ঘ) Performance Audition ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
ঙ) পুরাতন ও জটিল আইনসমূহ সংস্কার করতে হবে।
চ) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা বাতিল করে চাকরিতে Promotion & Incentives ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

০৬) প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ ঃ প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ এবং কর্মকাণ্ড হাতে নেয়ার পর জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
খ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

Scanned by CamScanner

০৭) **নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সংস্কার (Regulatory & Legal reforms) ঃ** প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা ও আইনগত সংস্কারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) সরকারি অফিসসমুহে অনর্থক কালক্ষেপণ যেন না হয় সেজন্য নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে।

খ) আইন মন্ত্রণালয়ে Clearing house প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সব আইন-কানুনের হিসাব রাখে।

গ) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

ঘ) Lower Reform Commission-এ কার্যকরী করতে হবে।

ঙ) Court সমূহের গতি এবং ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

চ) Judiciary-এর উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

ছ) Lowr Court সমূহের ওপর Supervision এবং monitoring জোরদার করতে হবে।

জ) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করতে হবে।

০৮) **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্কারসমূহ ঃ** প্রশাসনে ক্ষেত্রে সংস্কারকল্পে যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে সেজন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) সংস্কার কর্মসূচী এবং পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে Reforms Commission গঠন করতে হবে।

খ) Civil Servants হচ্ছে agents of change বা পরিবর্তনের প্রতিনিধি। অতএব তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি দিতে হবে।

গ) সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমসমূহ যেন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) সংস্কার কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে হাতে নিতে হবে। হঠাৎ কোনো ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিলে তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

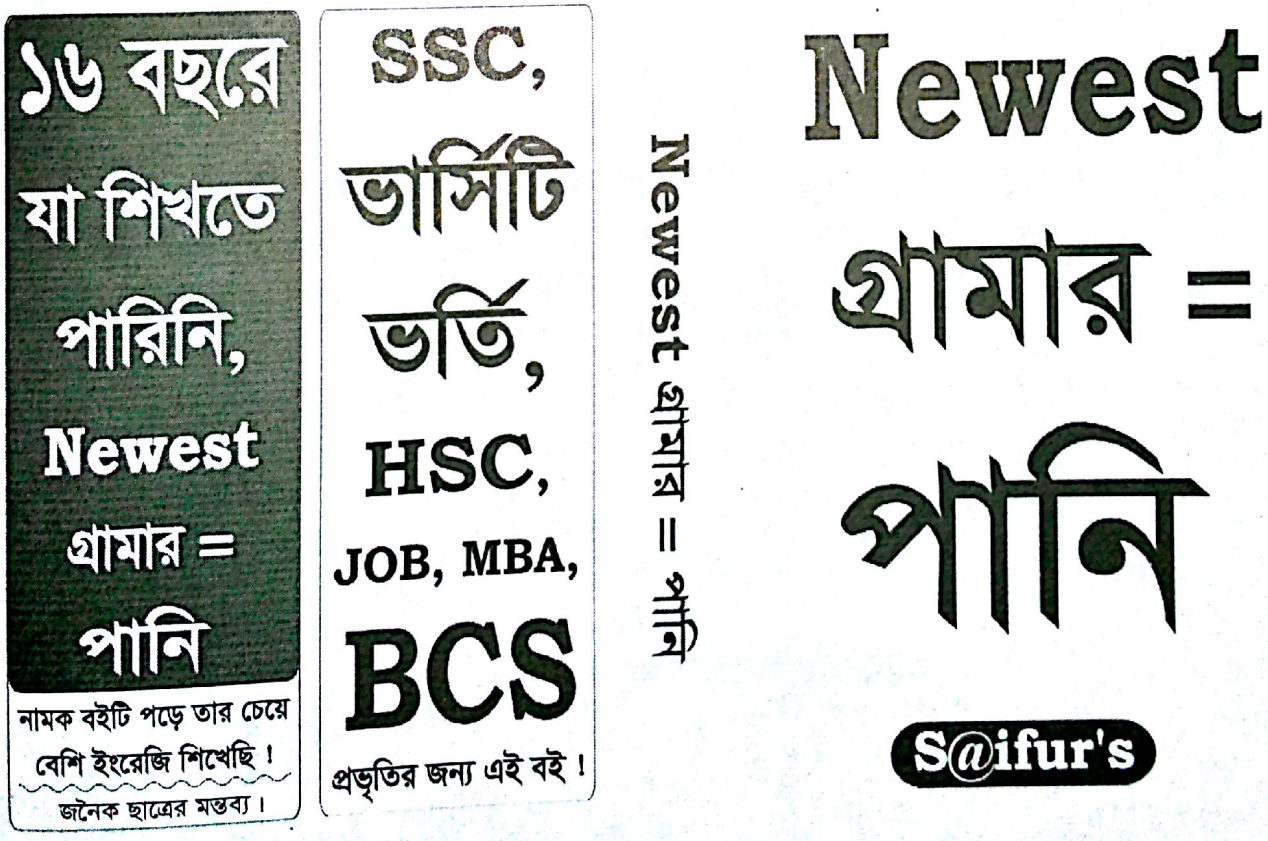

Scanned by CamScanner